বিহারের লোককথা

মীরা পাকড়াশী

বেস্টবুক্‌স্
১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী ১৯৫০

প্রচ্ছদ : আমিনুল আহ্‌সান

প্রকাশক :
বেস্ট বুক্‌স্
১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০৭

মুদ্রাকর :
কালাচাঁদ ঘোষ
বাণী আর্ট প্রেস
১১, নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিহারের লোককথা

হাসির ফুলঝুরি ছোট্ট সূর্যাকে

আর তার প্রিয়সঙ্গী 'দাদা' কৃষ্ণ পাকড়াশীকে

ভূমিকা

আজ বিজ্ঞান অভাবনীয়ভাবে এগিয়ে গেছে। প্রকৃতির গূঢ় রহস্যের অনেকখানিই মানুষ উদ্‌ঘাটন করেছে। পৃথিবীর দুর্গমতম স্থানেও মানুষের অভিযান সফল হয়েছে। এমন কি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানুষের জয়যাত্রা ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। রোগ, ব্যাধি প্রাকৃতিক ঘটনা ও বিপর্যয় যার কারণ মানুষের কাছে এই সেদিনও অজানা ছিল আজ তার অনেকখানিই হয়ে গেছে করতলের আমলকীর মতো।

এই পশ্চাদপটেও লোক কাহিনী গাথা এ সবের আকর্ষণ আমাদের কাছে কমেনি। তার কারণ বাইরের যা কিছু তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে মানুষের মন। সেই মন চায় কল্পনার জগতে বিচরণ করতে। সেখানে দুঃখ আছে কিন্তু সে দুঃখ যেমন ভাবেই হোক দূর হয়। তারপর আসে চিরদিন সুখে জীবন কাটানোর সুযোগ। লোক সাহিত্যের আকর্ষণের এটি একটি অন্যতম কারণ। এখনকার মানুষও তাই গল্পের উড়ন্ত গাছ, যাদুকরের কারসাজি এসব মেনে নেয়।

ভারতের লোক-সাহিত্যের উপর তেমন গভীর গবেষণা হয় নি। ভারতীয় লোককথা একটু-আধটু পরিবর্তিত হয়ে অন্য দেশের রূপকথা হিসাবে পরিচিত হয়েছে।

তবে সমস্ত পৃথিবীর লোককথার মধ্যেই কতকগুলি মিল, যাকে বলা হয় 'Motif' খুঁজে পাওয়া যায়। মানবজাতির এমন একটি সময়

ছিল যখন অবসর বিনোদনের উৎকৃষ্ট উপায় ছিল গল্প শোনা। সমস্ত দিনের কঠিন পরিশ্রমের পর সবাই ক্ষীণ আলোয় মিলিত হয়ে গল্প বলা ও গল্প শোনায় ব্যস্ত রাখত নিজেদের।

সেই প্রবহমান গল্পের ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষ। সব দেশে গল্পের ধরণ এক হলেও পরিবেশ অনুযায়ী তা পাল্টে গেছে। যেখানকার গল্প সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবনযাত্রা এসবের সঙ্গে মিশে গল্পগুলি নতুন রূপ নিয়েছে।

এইসব গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজ্যপাট, নদী, বন, সবেরই কাহিনী।

বিহারের এই লোককথাগুলি শুধু মানুষেরই কাহিনী। পশুপাখি থাকলেও তাদের স্থান নগণ্য। মানুষের সঙ্গে জড়িত থেকে তারা গল্পে তাদের ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের বীরত্ব, ক্ষুদ্রতা, হিংসা, মমতা সবই এইসব গল্পে প্রতিফলিত। এছাড়া লোকাচার, ব্রত পার্বণ, নানা ধরণের বিশ্বাস, কুসংস্কার আর যাদুর শক্তি রয়েছে এইসব গল্পে।

বিহারের ডাইনিদের ক্রিয়াকলাপ যা কল্পনাপ্রসূত নয় সত্যই যেটা পালিত হয় বিশেষ বিশেষ জায়গায় তাও আছে গল্পে।

'বীরকুমার' তার নামে রচিত গাথা এবং গানে অমর হয়ে আছে। পালামৌ জেলায় বীরকুমারের নামে প্রত্যেক অমাবস্যার রাত্রে একটি স্তম্ভ রচনা করে তার পূজা শুরু করা হয় পরে সমগ্র বিহারেই বীর-কুমারের পূজা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

বিহারে ডাইনিদের উপর বিশ্বাস শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় আদিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই বিশ্বাস শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত। ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা জেলা ছাড়াও চম্পারণ জেলায় ডাইনি বিশ্বাস করে এমন লোক প্রচুর। হয়তো নেপালের কাছাকাছি হওয়ায়

তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের প্রভাবে ডাকিনী তন্ত্র এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

সর্পপূজা বিহারের অনেক জায়গায় করা হয়। পালামৌ, পূর্ণিয়া, চম্পারণ, ভাগলপুর এই জেলাগুলিতেই বেশি প্রচলিত। এই সর্পপূজা শুধুমাত্র গ্রাম্য মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষিত মানুষও এতে অংশগ্রহণ করেন।

নাগপূজার সম্পর্কে নানা কাহিনী ও গান প্রচলিত আছে। সমগ্র বিহারে শ্রাবণ মাসে নাগপঞ্চমী পালিত হয়। এই সময় সর্পদংশনের ঘটনা প্রচুর ঘটে। গ্রামের মেয়েরা দল বেঁধে বেরিয়ে সারাগ্রামে সকালবেলা গান গেয়ে নাগপঞ্চমীর পুণ্যের কথা উল্লেখ করে টাকাপয়সা দিয়ে গম, চাল, চিনি, দুধ কিনে চাল গম যাঁতায় পিষে দুধ চিনি দিয়ে তার মণ্ড বানিয়ে তাই দিয়ে 'নাগ বাবা' ও 'নাগিনীর' মূর্তি তৈরী করে খুব ধুমধাম করে সেই সব মূর্তি নিয়ে গিয়ে মাটির তলায় পুঁতে দেয়। সঙ্গে কিছু দুধ মিষ্টি দেয় নাগ-নাগিনীর খাদ্য হিসাবে, সারাদিন সারা-রাত এই উৎসব চলে। যে মেয়েরা এই উৎসব পালন করেন সেদিনের জন্য তাঁদেরও নাগিনী বলা হয়। মুক্ত হস্তে তাঁদের সবাই চাঁদা দেন কতকটা হয়তো সাপের ভয়ে, কতকটা হয়তো ব্রতের প্রতি শ্রদ্ধায়। এই দিনটি হল কৃষ্ণাপঞ্চমী।

বিহারে নাগপূজা বহু প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। রাজগীরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করে ডঃ ব্লক এবং জন মার্শাল মনিয়ার মঠ আবিষ্কার করেছিলেন। . মনিয়ার মঠ 'মনিনাগের' বাসগৃহ কথিত আছে। 'মনি নাগ' মনিয়ার মঠের অধিষ্ঠাতা দেবতা।

লোক কাহিনীর পৃষ্ঠপট হিসাবে যে কথাগুলি বলা হল তার বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

কাহিনীগুলিতে রাজা, সৈন্য, ব্রাহ্মণ, সভাসদ্ সকলেই স্থান পেয়েছে। এসব কাহিনীতে রাজা ততটা দূরের লোক নন। যে কোন লোকই রাজার কাছে অনায়াসে যেতে পারে। চাতুর্য, শৌর্য, বীর্য, কোনকিছুরই অভাব নেই, বোকামির চূড়ান্ত দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে।

আদিবাসীদের কোন গল্প এখানে স্থান পায়নি। কারণ আদিবাসী-দের গল্প নিয়েই আলাদা সঙ্কলন করার অবকাশ আছে।

বিহার আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী রাজ্য কিন্তু বাংলা ভাষায় বিহারের লোককাহিনী চোখে পড়েনি। গল্পগুলি অধিকাংশই হিন্দী ও বিহারে প্রচলিত উপভাষা ভোজপুরী থেকে সংগৃহীত।

বেস্ট বুক্স্ আমাকে বাংলায় এই লোককথাগুলি পুনর্বর্ণনার সুযোগ দেওয়ায় ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

মীরা পাকড়াশী

সূচীপত্র

পাটনা নগরীর জন্মকথা

কোশাম্বি শহরে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল, কুশ ও বিকুশ। কুশ বিবাহ করলেন প্রমতিকে আর বিকুশ বিবাহ করলেন সুমতিকে। এঁরা ঋষি সর্বসিদ্ধির দুই কন্যা। কুশ ও বিকুশ দরিদ্র ছিলেন। তাই তাঁরা ভাগ্য ফেরাতে স্ত্রীদের নিয়ে দেশান্তরে চলে গেলেন।

কিন্তু বেশ কিছুদিন চলে গেল, তাঁরা না পেলেন কোন কাজ, না জুটল ভাগ্যে কিছু টাকা। অগত্যা স্ত্রীদের ঘুমন্ত অবস্থায় বনের মধ্যে ফেলে একরাত্রে তাঁরা পালিয়ে গেলেন।

পার্বতী ও শিব সেই বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই দুই নারীর দুঃখে বিগলিত হয়ে পার্বতী শিবকে অনুনয় করতে লাগলেন এদের দুর্দশা দূর করার জন্য। মহাদেব ভবিষ্যৎবাণী করলেন সুমতির একটি সন্তান হবে, যার নাম হবে পুত্র। আর এই পুত্র যখনই ঘুম থেকে উঠবে তখনই এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ঝরে পড়বে তার মাথা থেকে। মহাদেবের এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য হল। প্রথম যেই শিশু পুত্র ঘুম থেকে উঠল, অমনি তার মাথা থেকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ঝরে পড়ল। মায়েরা ভাবলেন এ বুঝি কোন চোরাই টাকা। ভয়ে তাঁরা সেই বন ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু যেখানেই যান সেই একই আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে লাগল। তখন তাঁরা রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন। সুমতি

ও প্রমতি পুত্রকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন। কাশীতে পুত্র ধীরে ধীরে বড় হলেন। বলাই বাহুল্য তিনি খুব ধনী এবং দানশীল হলেন।

দানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় দেশ-দেশান্তর থেকে লোক আসতে লাগল তাঁর কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে। এদিকে কুশ-বিকুশ তখন কর্ণাট দেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন। পুত্রের দান-শীলতার কথা জানতে পেরে তাঁরা কাশীতে চলে এলেন পুত্রের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে। অট্টালিকার অলিন্দ থেকে সুমতি তাঁদের দেখেই চিনতে পারলেন। ওঁদের তিনি ডেকে পাঠালেন এবং প্রচুর সম্মান দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। দুই ভাই এখন কাশীতে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

ঈর্ষায় কিন্তু বিকুশ নিজের আত্মজের উপর জ্বলে উঠলেন। তিনি দুজন চণ্ডালকে পুত্রের কাছে পাঠালেন। তারা এসে বলল আপনাকে বিনধ্যাসনীর পূজা দিতে যেতে হবে। আপনার জন্মের আগে আপনার মা এই পূজার মানত করেছিলেন। পিতার কাছে জিজ্ঞাসা করায় বিকুশ এই চণ্ডালদের কথা সমর্থন করলেন। চণ্ডালরা দেবী বিনধ্যাসনীর মন্দিরের পাণ্ডা পরিচয়ে পুত্রকে গভীর বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ষড়যন্ত্রের কথা খুলে বলল। তাঁর পিতা তাঁকে হত্যা করতে চান এই শুনে পুত্র এতই মর্মাহত হলেন, তাঁর আর বাঁচবার ইচ্ছা রইল না। কিন্তু যতবারই হত্যা করতে গেল ততবারই ঘাতকের হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। তারা পুত্রকে যখন কিছুতেই হত্যা করতে পারল না তখন প্রচুর টাকার বিনিময়ে তাঁকে ছেড়ে দিল।

মাত্র ষোল বছরের কিশোর পুত্র একা সেই গভীর বনের মধ্যে কি করবেন ভেবে পেলেন না। একটি বটগাছের উপর উঠে বসে রইলেন।

সেই গাছে আবার উঠে পড়ল সঙ্কট ও বিকট নামে দুই দৈত্য। তারা পুত্রের কিছু ক্ষতি করল না বরং ওদের মধ্যে একটা বিবাদের মীমাংসা করে দিতে বলল।

এই দৈত্যরা করিবক নামে এক দৈত্যের সন্তান। করিবক একবার মহাদেবকে তুষ্ট করে তিনটি দান লাভ করে। একজোড়া জুতো যা পায়ে দিলে মুহূর্তে হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যাওয়া যায়, একটি থলি যাতে হাত ডোবালেই হাতে উঠে আসবে মুঠোমুঠো মণিমাণিক আর একটি কাঠি যা মাথার উপর ঘোরালেই সৃষ্টি হবে এক অপূর্ব নগরী। করিবকের দেহান্ত হয়েছে তাই তার সন্তানদের মধ্যে এই বস্তুগুলির অধিকার নিয়ে কলহ আরম্ভ হয়েছে। পুত্রের কাছে ওরা বিচার চাইল। কে এই জিনিসগুলির যোগ্য অধিকারী।

পুত্র বললেন, 'তোমরা দুজনে ঐ যে বিশাল শালগাছটি দেখতে পাচ্ছ ঐটিকে ছুঁয়ে এস। যে আগে এসে এই জিনিষগুলি কুড়িয়ে নিতে পারবে সেই হবে এসবের উত্তরাধিকারী।'

যেই ওরা দৌড়তে আরম্ভ করল দৈববাণী হল 'পুত্র তুমি এই জুতো জোড়া পরে সিংহল দ্বীপে উড়ে চলে যাও।'

সিংহলে পৌঁছেই পুত্র দেখা পেলেন শ্বেতপরিচ্ছদ পরিহিত এক ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণ তাঁকে ডাকলেন এবং ভবিষ্যৎবাণী করলেন 'রাজা পাটলেশ্বরের কন্যা পাটলির সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে।'

সেই রাত্রে নিভৃতে পুত্র রাজকুমারী পাটলির শয়নকক্ষে প্রবেশ করে নিজের পরিচয় দিলেন। রাজকুমারী সব শুনে তখনই পুত্রের সঙ্গে যেখানেই তিনি যাবেন চলে যেতে চাইলেন। পুত্র আবার জুতোজোড়া পায়ে দিলেন। এবার মুহূর্তের মধ্যে চলে এলেন গঙ্গার

দক্ষিণ কূলে একটি জায়গায়—গয়ার উত্তরে। শোনভদ্রার পূর্বে এবং পুনপুনার পশ্চিমে। নারদ মুনি এসে পুত্রকে বললেন, 'তুমি এই যাদু কাঠি ঘুরিয়ে সৃষ্টি কর একটি নগরীর।' নারদমুনির আজ্ঞা শিরোধার্য করে পুত্র এক নগরীর পত্তন করলেন এবং নিজের ও স্ত্রীর নাম যুক্ত করে নাম রাখলেন পাটলিপুত্র। পরে তিনি প্রবল পরাক্রমশালী রাজা হলেন। বহু দেশে নিজের বিজয় নিশান ওড়ালেন। আর তাঁর মা ভগ্নহৃদয়ে একদিন দেহত্যাগ করলেন।

পুত্রের পুত্র কুসুম যখন রাজা হলেন তখন এই নগরীর নাম পাল্টে নাম রাখলেন কুসুমপুর। রাজা কুসুমের একটি পুত্র ছিল তার নাম ছিল পাটন আর একটি কন্যা তাঁর নাম পাটনা। পাটনা বিবাহ না করে আজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে দেবতারা দেবীরূপে সম্মানিত করলেন। কুসুমপুর এবার পাটনা নামে পরিচিত হল। আজ অবধি বিহারের রাজধানী পাটনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে আছেন তিনি।

বীরকুমার

অনেককাল আগে বিহারে বীরকুমার বলে এক যুবক ছিল।' সে ছিল জাতিতে আহির। আহির হচ্ছে বিহারের গোয়ালা সম্প্রদায়। যারা গবাদি পশু পালন করে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন দই, মাখন, খোয়াক্ষীর, ঘি, এইসব জিনিসের ব্যবসা করে।

তখনকার দিনে বিহারের অনেকখানিই ছিল গভীর বন। সেই বনে বাঘ, নেকড়ে এবং অন্য সব বন্যপ্রাণী বিচরণ করত। শাল, নিম,

বট এই সমস্ত বিশাল বৃক্ষরাজির প্রাচুর্য ছিল বনে। আহিররা এই সমস্ত নিবিড় বনেই তাদের পশু চরাত। ওরা খুব বলিষ্ঠ ও সাহসী হত। বীরকুমার ছিল ওদের নেতা।

দিন বেশ কাটছিল ; এমন সময় কিছু গরু, মোষ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে মারা গেল। কেউ কিছু বুঝতে পারল না কেন এমন হল। বীরকুমার ছিল আহিরদের নেতা, তাই সকলে তার পরামর্শ নিতে এল। গভীর বনে ডাইনীদের বাস। ওদের অশুভ শক্তিবলে ওরা মানুষ ও পশুকে নিধন করতে পারে। একেবারে গহন বনের মধ্যে তারা তাদের ডাকিনীতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ অভ্যাস করে। বীরকুমারের সন্দেহ হল যে ডাইনীরাই এই গবাদি পশুদের মৃত্যুর কারণ। সোহরাই-এর (অমাবস্যার) রাত্রে লাঠি আর তীরধনুক নিয়ে বীরকুমার চলে গেল অরণ্যের গভীরতম স্থানে। লোকের বিশ্বাস অমাবস্যার রাত্রেই সব ডাইনীরা এক জায়গায় সমবেত হয়। একটা গুলার গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বীরকুমার ডাইনীদের দেখতে পেল। তাদের ঠোঁট ফাটা, কোঁকড়ানো শিকড়ের মত আঙুল, কালো হাঁড়িপানা মুখ, তাতে মূলোর মত দাঁত বেরিয়ে আছে। যেমন রোগা, তেমনি লম্বা, এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে। পরনের শাড়ি খুলে রেখে তারা ঝাঁটা হাতে উলঙ্গ হয়ে নাচছে। বীরকুমারের ছিল প্রচণ্ড সাহস। এই সাংঘাতিক দৃশ্য দেখেও দমল না। ওদের সব শাড়ি তুলে নিল। ওরা বীরকুমারকে শাড়ি ফেরৎ দেওয়ার জন্য সাধ্যসাধনা করতে লাগল। বীরকুমার বলল, "তোমরা প্রতিজ্ঞা কর আমাদের গরুবাছুরের উপর কুদৃষ্টি দেবে না। তা না হলে আমি শাড়ি ফেরৎ দেব না।" ওরা বীরকুমারকে হত্যা করার ভয় দেখাল তবুও বীরকুমার অটল রইল।

যখন বীরকুমারের কাছ থেকে ডাইনীরা শাড়ি আদায় করতে পারল না কিছুতেই, তখন তারা তুকতাক করে একুশটা বাঘ ডেকে আনল। হিংস্র চোখ এবং বিশাল হাঁ করা মুখ নিয়ে সেই একুশটা বাঘ বীরকুমারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর মুহূর্তের মধ্যে বীরকুমারের দেহটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সেই সময় সমস্ত বন কাঁপিয়ে শোনা গেল ডাইনীদের ভয়ঙ্কর বর্বর অট্টহাসি। বীরকুমারের কানের মাকড়ি ও হলুদরঙের ধুতি রক্তসিক্ত হয়ে পড়ে রইল। পড়ে রইল তীরধনুক আর লাঠি। তার বলিষ্ঠ, সুঠাম যৌবনদৃপ্ত দেহের একটি কণাও রাখেনি ডাইনীর বাঘেরা।

পরদিন সকালে বীরকুমারের আত্মীয়স্বজন তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। শেষে তারা এই চিহ্নগুলি খুঁজে পেল।

বীরকুমার একজন প্রবাদপুরুষ হয়ে রইলেন, লোকে তাঁর পূজা করে। বিহারের সর্বত্র বীরকুমারের নামে গাঁথা রচনা করে গাওয়া হয়।

বিহারের পালামৌ জেলায় প্রতি অমাবস্যার রাত্রে বীরকুমারের স্মৃতির উদ্দেশে একটি ছোট স্তম্ভ রচনা করে আহিররা তাঁর পূজা করে।

অরণ্যদেবীর কাহিনী

অনেকদিন আগে মোরধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দয়ালু, দানশীল, মহাপ্রাণ, সরল ও সচ্চরিত্র ছিলেন। সারা ভারতে তাঁর দান-ধ্যানের খ্যাতি ছিল। বিহারের আরা শহরের এখনকার চৌধরানী মহল্লা, জৈন বিদ্যালয়ের চতুঃসীমা দেবী আস্থান পর্যন্ত ছড়িয়ে অবস্থিত ছিল রাজা মোরধ্বজের বিশাল দুর্গ।

রাজার এমন সুখ সমৃদ্ধির মধ্যেও ছিল একটি দুঃখের কাঁটা। রাজা ছিলেন অপুত্রক।

দেবী দুর্গার কাছে রাজারানী একটি পুত্রলাভের জন্য আকুল প্রার্থনা করলেন। রাজা মোরধ্বজ স্বপ্নে দেবীর দর্শন পেলেন।

রাজা একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন। রাজপ্রাসাদ সুখে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। শিশুটিকে স্নান করান হল। শূন্যে পাঁচবার ছুঁড়ে দিয়ে পুরনারীদের একজন তাকে লুফে নিলেন আর একজন তখন একটি পেতলের থালা বাজাচ্ছিলেন। রানী তাঁর পরিচারিকাদের মুঠো মুঠো শস্য আর সোনা দান করলেন।

তিনদিন পরে শিশু রাজপুত্রকে নিমপাতা সিদ্ধ জলে আবার স্নান করান হল। তারপর একমুঠো রাইসরষে আর একমুঠো জোয়ান রানীর মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে মাটির মালসায় রেখে তাতে আগুন জ্বেলে দেওয়া হল। সরষে জোয়ান পুড়ে যাবার পর রানী মালসাটা উল্টে ফেলে বাঁ পায়ের লাথি মেরে ভেঙে ফেললেন। এই ভাবে শিশু রাজপুত্রকে ভূত-প্রেতের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচান হল।

ভূতপ্রেতের কুদৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত রাজকুমার বড় হয়ে উঠলেন এক পরাক্রমশালী যুবক রূপে।

বেশ কয়েকবছর রাজপুত্রকে নিয়ে রাজা মোরধ্বজ ও তাঁর রানী সুখে শান্তিতে কাটালেন। কিন্তু সুখ মানুষের সয় না।

একদিন রাত্রে রাজা একটা রোমহর্ষক ভীষণ স্বপ্ন দেখলেন। দেবী দুর্গা তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন—রাজা মোরধ্বজ আর তাঁর রানী যেন তাঁদের দুজনের মাঝখানে তাঁদের একমাত্র সন্তানকে দাঁড় করিয়ে রাজকুমারের মাথার মাঝখান থেকে করাত (আরা) দিয়ে তার দেহ

দ্বিখণ্ডিত করেন। রক্তে দেবীর বেদী প্লাবিত হয়ে যাক তবু যেন রাজা-রানীর চোখে একবিন্দু অশ্রু না দেখা দেয়, যেন তাঁরা অবিচলিত থেকে দেবীকে এই বলিদান দিতে পারেন, না হলে দেবী এই উৎসর্গ সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করবেন কি করে?

এই স্বপ্ন রাজার মনকে কুরে কুরে খেতে লাগল। রাজা মোরধ্বজ রানীর কাছে তাঁর স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলেন।

দেবী দুর্গার নিষ্ঠাবান ভক্ত হিসেবে তাঁরা সন্তানকে উৎসর্গ করাই স্থির করলেন।

যখন রাজকুমার শুনলেন দেবীর আদেশের কথা, তিনি বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। বরঞ্চ দেবীর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবেন ভেবে আনন্দিত হলেন।

তারপর তাঁরা—রাজা মোরধ্বজ, তাঁর রানী এবং একমাত্র পুত্র—দেবী দুর্গার বেদীর সামনে এসে দাঁড়ালেন, নির্বাক, রুদ্ধশ্বাস।

রাজা ও রানী রাজপুত্রের মাথার মাঝখানে করাত রেখে যেই চালাতে যাবেন—সমস্ত পরিমণ্ডল ভরে উঠল বিবিধ ফুলের সৌরভে—ভেসে গেল চারদিক নরম আলোয়।

দেবী দুর্গা আবির্ভূতা হয়েছেন তার মহিমামণ্ডিত রূপে—তাঁর দশহাত অলঙ্কারমণ্ডিত। মাথায় স্বর্ণকিরীট ঝলমল করছে। সিংহ-বাহিনী দেবীর মুখমণ্ডল জ্যোতির্মণ্ডিত।

দেবী রাজারানী ও তাঁদের একমাত্র পুত্রকে তাদের অবিচলিত ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলেন।

যেখানে মোরধ্বজ তাঁর একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন দেবীর পদতলে, সেই স্থানের নাম হল আরা। কথিত আছে রাজা মোরধ্বজ

আরাতে দেবীর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইনিই হচ্ছেন অরণ্যদেবী শতশত ভক্ত রোজ পূজা-উপচার সাজিয়ে তাঁর পূজা দিতে আসেন।

আরা বিহারের বর্তমান রাজধানী পাটনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত—শাহাবাদ জেলার সদর। এইখানে চক মহল্লায় অরণ্যদেবীর মন্দির।

ভদ্দর

শনি আঢ়াই মঙ্গল তিন
রবি গুর বর্সে আওঠো দিন।

বৃষ্টি নামলে শনিবারে কিংবা মঙ্গলবারে
ঝরবে তিনটি দিন॥
রবিবার আর বৃহস্পতিতে বৃষ্টি হলে সুরু
জেনো থামবে নাকো ঝাড়া আটটি দিন॥

এটি একটি বিহারের প্রবাদ। আরও একটি বলি—

আওত অদর ন দিয়ে যৎ ন দিয়ে হস্ত
কহেঁ ভদ্দর দৌ গয়ে বণিতা ঔ গৃহস্ত

যদ্দি না হয় বর্ষণ হাথিয়াতে বর্ষায়।
ভদ্দর বলে কৃষক ও গৃহস্থ দুজনায় পস্তায়॥

এমনি আরও অনেক প্রবাদ ভদ্দরের রচনা বলে কথিত আছে। ভদ্দর বিহারের শাহাবাদ জেলায় জন্মেছিলেন। ভদ্দরের জীবনকাহিনীতে

অনেক চমক আছে। ছোটবেলায় একজন বিখ্যাত যাতুকর এবং জ্যোতিষী ওঁকে চুরি করে নিয়ে যান। সুদর্শন ও বুদ্ধিমান এই বালক ক্রমে জ্যোতিষের গভীর জ্ঞান অর্জন করল। ভদ্দরের পালকপিতা তার রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে আপন কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। কিন্তু ভদ্দরের মনে সুখ ছিল না। তিনি চাইতেন তাঁর নিজের দেশে ফিরে যেতে। জ্যোতিষী বিদ্যার সাহায্যে তিনি নিজের দেশের হদিস পেলেন। গণনা করে তিনি যাত্রার শুভ মুহূর্তটিও খুঁজে পেলেন। তিনি ঠিক করলেন কাউকে কিছু না বলে চুপিচুপি পালিয়ে যাবেন। ভদ্দর ভাবলেন তাঁর স্ত্রী তাকে ছাড়বেন না৷ আবার নিজেও তাঁর সঙ্গে যাবেন না।

এদিকে তাঁর স্ত্রীও ছিলেন একজন দক্ষ জ্যোতিষী। তিনি ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারতেন। তিনি স্বামীর অভিসন্ধি বুঝতে পারলেন আর তাই সে-রাত্রে অনেক দেরী করে রান্না করলেন। ভদ্দর যখন আহারে ব্যস্ত তখনই যাত্রার শুভমুহূর্ত উপস্থিত। ভদ্দর তখন জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী যাত্রার পদক্ষেপটি করে রাখলেন—যাতে তাঁর যাত্রা সফল হয়।

তাঁর স্ত্রী পদক্ষেপের অর্থ বুঝতে পারলেন। তিনি কিছুই বললেন না কিন্তু ভদ্দরকে যে নদী পেরিয়ে তাঁর দেশে যেতে হবে সেই নদীতে যাতুমন্ত্র পড়ে দিলেন।

ভদ্দর খেয়ে উঠে চারপাইতে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলেন। তাঁর স্ত্রীও ঘরকন্নার কাজ সেরে এসে বিছানায় ঘুমের অভিনয় করে শুয়ে রইলেন।

ভদ্দর চুপিচুপি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে একখানি নৌকায় উঠে

বসলেন নদী পার হবার জন্য। কিন্তু যেই নৌকা মাঝনদীতে পড়ল অমনি আকাশ পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘে ছেয়ে গেল আর আরম্ভ হল মুষলধারে বৃষ্টি। প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস বইতে লাগল। ভদ্দরের ছোট্ট নৌকাখানি টুকরো টুকরো হয়ে গেল। একা ভদ্দর সেই নিঃসীম অন্ধকারে উথাল-পাথাল নদীতে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। কিন্তু শুভ মুহূর্তে যাত্রা করেছেন বলে তাঁর মৃত্যু হল না। বিরাট চেহারার এক রুইমাছের দয়া হল ভদ্দরের ওপর—তাই সে নিজের পিঠে করে নিয়ে ভদ্দরকে নদীর অপর পারে রেখে এল।

আর ভদ্দর নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে কী দেখলেন? দেখলেন এক অবগুণ্ঠনবতী নারীকে। সে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল—জ্যোৎস্নায় ফুটে উঠল তাঁরই সেই দর্পিতা স্ত্রীর মূর্তি। ভদ্দর তাঁর অনুতাপের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিলেন। ক্ষমা করলেন তাকে। তারপর? দু'জনে সুখে জীবন কাটাতে লাগলেন।

লোরিক ও মঞ্জরী

আগোরীর দোসাদ রাজা মাল্যজিৎ একদিন ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করলেন যে, আগোরীতে যত সুন্দরী মেয়ে জন্মাবে সবাই প্রাসাদে মানুষ হবে এবং সবাইকে রাজা বিবাহ করবেন।

আগোরীর অধিবাসী মাহারার একটি কন্যাসন্তান জন্মাল। মাহারা আর তার স্ত্রী পদ্মাবতী রাজার ভয়ে ঘটনাটা গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু যে দাসী শিশুটিকে মানুষ করছিল সে স্বামীর কাছে গোপন কথাটি বলে ফেলে। তার স্বামী আবার সেই কথা রাজার কানে

তোলে। রাজা মেয়েটিকে আনবার জন্য মাহারার কাছে সৈন্য পাঠালেন। মাহারা নিজে রাজার কাছে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ আপনি কিভাবে আমার মেয়েকে মানুষ করবেন?" রাজা বললেন, "আমার রানী তাঁর অন্য সন্তানদের সঙ্গে একেও মানুষ করে তুলবেন।" এই কথা শুনে মাহারা বললেন, "মহারাজ, রানী মাতৃস্নেহে যে মেয়েকে বড় করে তুলবেন সে তো আপনার কন্যাস্বরূপা হবে, তাকে আপনি বিবাহ করবেন কি করে?" রাজা এ কথার উত্তর খুঁজে পেলেন না। তখন মাহারা বললেন "মহারাজ! আমিই আমার কন্যাকে মানুষ করি, তারপর একজন দুর্বল লোকের সঙ্গে তার বিবাহ দেব। তাকে হত্যা করে আপনি আমার কন্যাকে বিবাহ করবেন। এতে আমারও মর্যাদা রক্ষা হবে আপনারও মনস্কামনা পূর্ণ হবে।" রাজা এই প্রস্তাব মেনে নিলেন।

মঞ্জরী একটি কুসুমকলিকার মত যৌবন-সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠল। তখন মাহারা ব্রাহ্মণ এবং নাপিতকে পাঠালেন তার উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে। কিন্তু মঞ্জরীর উপযুক্ত কোন পাত্র পাওয়া গেল না। মঞ্জরীর মন তার পিতার জন্য দুঃখে ভরে গেল। সে ঠিক করল সে আত্মঘাতিনী হবে। সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। কিন্তু গঙ্গার ঢেউ তাকে কূলে ফিরিয়ে দিল। মঞ্জরী ভাবল "আমি এতই পাপিষ্ঠা যে গঙ্গারও আমার উপর দয়া হল না।" গঙ্গাদেবী এক বৃদ্ধার ছদ্মবেশে এসে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। মঞ্জরী দেবী গঙ্গার সামনে বিলাপ করতে লাগলেন। দেবী কথা দিলেন তিনি মঞ্জরীকে সাহায্য করবেন। গঙ্গা তখন ভাবীকালের দেবী ভাবীকে বললেন মঞ্জরীকে সাহায্য করতে। ভাবী-দেবী তখন ইন্দ্রের কাছে গেলেন। ইন্দ্র ভাবীকে পাঠালেন বশিষ্ঠের

কাছে। বশিষ্ঠ গণনা করে বললেন মঞ্জরীর বিবাহ হবে গৌরা-গুজরাতের লোরিকের সঙ্গে এবং সেই বিবাহ সম্পন্ন হবে বুড়কুবের বাড়িতে। দেবী ভাবী মঞ্জরীকে বুড়কুবের বাড়ির রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। মঞ্জরী পিতামাতার কাছে ফিরে এল এবং লজ্জাসরম না করে নিজের মাকে সব জানাল। তখন মঞ্জরীর মামা শিবচন্দ্র গৌরা-গুজরাতের দিকে রওনা হলেন। গৌরা-গুজরাতের রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি আসতেই ওখানকার রাজা সহদেব তাঁকে ডেকে পাঠালেন। রাজার ইচ্ছা তাঁর কন্যার সঙ্গে লোরিকের বিবাহ দেবেন। শিবচন্দ্র কোনরকমে রাজা সহদেবের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে বুড়কুবের বাড়ি পৌঁছলেন। বুড়-কুবে লোরিককে বোহা গ্রাম থেকে ডেকে পাঠালেন। লোরিক ভাবলেন মঞ্জরীব পাণিগ্রহণ করতে গেলে বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহ করতে হবে তাই তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কিন্তু বুড়কুবে ও শিবচন্দ্র তাকে অনেক বুঝিয়ে তিলক গ্রহণ করতে রাজি করালেন। গৌরা-গুজরাতের রাজা সহদেব রাগে জ্বলে উঠলেন। তিনি ঢোল-সহরৎ করে সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে কেউ বুড়কুবের বাড়িতে তিলক অনুষ্ঠানে কিংবা বারাতে (বরযাত্রা) যোগ দেবে, তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। দেবী দুর্গার দয়ায় চৌষট্টি যোগিনী এসে মঙ্গলগান (শুভবিবাহের গান) গাইতে লাগলেন। তিলক খুব ধূমধাম করে হল। লোরিকের দাদা সম্বরু ঠিক করলেন যে মাত্র তিনি নিজে, বর, ব্রাহ্মণ ও নাপিত এই চারজন বারাতে যাবে। প্রাসাদের সামনে যখন বারাত এল তখন রাজা সহদেবের কন্যা চানোআ লোরিককে দেখল। দেখেই তার মনে অনুরাগ জাগল। সে তার মার কাছে লোরিককে বিবাহ করার বাসনা জানাল। রাজা সহদেব সম্বরুর কাছে চানোআর সঙ্গে লোরিকের

বিবাহের প্রস্তাব দিলেন এবং মাহারা যে বরপণ দেবেন মঞ্জরীর জন্য রাজা তার দ্বিগুণ দিতে চাইলেন কিন্তু সম্বরু রাজি হলেন না। রাজা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। যত খেয়া নৌকা ছিল সব তিনি ডুবিয়ে দিলেন যাতে বরযাত্রী নদী পার না হতে পারে। সম্বরু বুড়কুবেকে একটা খাঁচীতে (খাঁচা) পুরে নদী পার করালেন। আর সকলে সাঁতার কেটে পার হল। এমনি করে তারা অনেক নদী পার হয়ে পাহাড়ে উঠে বন অতিক্রম করে কোতোয়ানগরভাদোখায় চলে এল। তারা যেতে যেতে বরযাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। প্রচণ্ড যুদ্ধ করে তারা রাজা চিত্রসেনকে পরাজিত করল। এবার তারা সোনপি নদীর তীরে এসে পৌঁছল। এইখানে রাজা মাল্যজিতের ধোপারা ধুতি শুকোচ্ছিল। বরযাত্রীরা এইসব ধুতি কেড়ে নিয়ে পরে আগোরিতে এল। মঞ্জরীর মামা শিবচন্দ্র এত বরযাত্রী দেখে একটু ঘাবড়ে গেলেন। বরযাত্রীর সংখ্যা কমানোর চেষ্টা একান্ত বৃথা হল। শিবচন্দ্র নিজে সকলকে খাদ্য পরিবেশন করতে লাগলেন। মাহারাও তাঁকে সাহায্য করলেন।

কথিত আছে মাহারা বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের অতিথিদের ধাঁধাঁ হেয়ালীর উত্তর প্রত্যুত্তরের আয়োজন করেছিলেন।

মঞ্জরী ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করল যেন তার বিবাহ নিরাপদে হয়। লোরিক যেই মাড়োয়ায় প্রবেশ করলেন অমনি রাজা মাল্যজিৎ তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করলেন। লোরিক বীরের মত মাল্যজিতের সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। বিবাহস্থল হয়ে উঠল রণস্থল। চৌসার মাঠে রাজা মাল্যজিৎ স্বয়ং লোরিকের সঙ্গে এক ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করলেন। শেষে লোরিকের জয় হল। লোরিক মাল্যজিতের প্রাসাদ দুর্গ ধ্বংস করল।

পরদিন লোরিকের সঙ্গে মঞ্জরীর বিবাহ হল। তিনি বিস্তর বরপণ পেলেন।

মঞ্জরীকে নিয়ে লোরিক গৌরা-গুজরাতে চলে গেলেন।

ময়ূর ভাইটির গল্প

মা অনেকদিন মারা গেছে। সৎমা খুব বকে, মারে, কষ্ট দেয়। কিন্তু সৎ বোনটি দাদাকে বড় ভালবাসে। দাদা না হলে খেলবে কার সঙ্গে? বোনটি বড় হয়ে উঠল। সে দেখল মা দাদাকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। তার রাগ হত। মা দাদাকে কিছু কষ্ট দিলেই সে মার সঙ্গে ঝগড়া করত। কিন্তু ওর মা ওর কথা শুনতই না। একই রকম ভাবে সৎছেলের উপর অত্যাচার করত। একদিন মা দাদাকে খুব মারল, বোনটি সারাদিন উপবাস করে রইল মা যাতে আর দাদাকে না মারে কখনও।

এই দেখে সৎমা ছেলেটিকে যেমন করেই হোক সরিয়ে দেবে সংকল্প করল। মা একদিন পুঁটিমাছ রান্না করে ছেলেকে খেতে দিল। ছেলে তো পুঁটিমাছ ভালবাসে। সে পেট ভরে খাবে বলে একটি মাছ মুখে দিতেই তার শরীরে পালক গজিয়ে গেল। সে পরিণত হল একটি ময়ূরে। সৎমা পুঁটিমাছে যাদুমন্ত্র পড়ে রেখেছে যে। বোনটি সব দেখল। ময়ূরটি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেই মেয়েটিও কাঁদতে কাঁদতে তার পিছু পিছু চলল। কেঁদে কেঁদে সে বলতে লাগল:

"ভাইয়া হাও ভাইয়া সভ মাছ খাইয়া পোঠি মাছ জুনী খাইয়া।"

(দাদা আমার সব মাছ খেও গো পুঁটি মাছ খেও না) যেতে যেতে

মেয়েটি ময়ূরটিকে হারিয়ে ফেলল। তবু সে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিল দাদার জন্য। এমন সময় সেই পথে যাচ্ছিলেন রাজা রতন সিংহ। তিনি দেখলেন মেঘের মতো কালো চুল আর পাকা গমের মতো গায়ের রং পরনে লাল শাড়ি সবুজ চোলি একটি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। কী সুন্দর তাকে দেখাচ্ছে! রাজা থামলেন সেখানে। মেয়েটিকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি প্রাসাদে নিয়ে এসে মেয়েটিকে বিবাহ করবেন স্থির করলেন।

রাজা বিবাহের আয়োজন আরম্ভ করলেন। পঞ্জিকা থেকে মুহূর্ত বার করবার জন্য পুরোহিতকে ডেকে পাঠালেন। তারপর ডেকে পাঠালেন স্বর্ণকারকে। নববধূর জন্য অলঙ্কার প্রস্তুত করবে। বাহুতে নতুন রানী পরবেন বিরখি, বিজৌথা। কবজীতে পরবেন তিনখণ্ডি, লঘুরি, জিগ্‌গা কঙ্গন এবং চুড়ি। কটিতটে পরবেন কমরকস, কণ্ঠে নওলখা। কানে দুলবে মচ্ছরিয়া এবং ঝিমঝিমিয়া, নাকে পরবেন নথ। আর পদযুগলে পাঁইজাব ও ঘুঙ্গুরু।

বিয়েব দিনে সোনালী জরির কাজ করা শাড়ি পরে অলঙ্কারে ঝলমল করতে লাগলেন তিনি। তাকে মাড়োয়াতে নিয়ে আসা হল। মাড়োয়ার চালে জ্বলছে চৌমুখ (প্রদীপ) মাথায় মৌরী পরিয়ে দিল নাপিত। বরকনের গাঁটছড়া বাঁধা হল। তাঁরা পবিত্র অগ্নিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। রাজা রানীর সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন। কোহ্‌বর, যেখানে বিবাহের দিন গৃহদেবতাকে এনে রাখা হয়েছে সেখানে দুজনে এসে প্রণাম করলেন। এইবার তাঁরা দুজনে স্বামী স্ত্রী হলেন।

রাজা তাঁর নববিবাহিতা সুন্দরী রানীকে দেখে মুগ্ধ ও আনন্দিত,.

কিন্তু রানী নির্বাক। রাজা কতদিন অনুনয় করলেন, সাধ্য সাধনা করলেন কিন্তু রানী মুখ খুললেন না। রাজা তখন মরিয়া। রাজা একদিন জনরব ছড়িয়ে দিলেন যে তিনি মারা গেছেন। যা চেয়েছিলেন তাই হল। তার নির্বাক বধূর মুখে কথা ফুটলো তিনি বললেন—

"কান থী রতন সিংঘ কান থী পদম সিংঘ"
কান থী ননদো খিয়া
হাম তা তাহিয়ে কনলহঁ জাহিয়া
ভাই বেহী কে ভেলা ময়ুরা"

(আমার ভাই (দাদা) ময়ুর হয়ে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল এখন কেবা রতন সিংঘ কেবা পদমাসিংঘ আর তাদের কার কি হল তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। ভাইকে হারানোর পর আর কোন দুঃখই আমার মনকে ছুঁতে পারে না)

রাজা এই কথা শুনে তাঁর অনুচরদের বললেন "আমার রাজ্যের বনাঞ্চল থেকে সব ময়ুর নিয়ে আসুন।"

রানীকে রাজসভায় আনা হল। রানী ঘোষণা করলেন "এই সব ময়ুরের মধ্যে যে আমার দাদা, সে এসে এই বাটি থেকে জল খাক। অত ময়ুরের মধ্যে একটি ময়ুর এল রানীর হাত থেকে জল খেতে। রানী কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন আর কৃষ্ণের পাদোদক ছিটিয়ে দিলেন সেই ময়ুরের গায়ে।

আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সবাই দেখল তরুণী রানীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি ষোল বছরের তরুণ। রাজা তাঁর শ্যালককে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাকে নিজের রাজ্যে একটি উচ্চপদে বসালেন।

রাজা বিক্রমজিৎ ও বিগু

রাজা বিক্রমজিতের আবাল্য সহচর ভৃত্য বিগু। বিক্রমজিৎ বহু বৎসর ধরে পড়াশুনা করে চৌষট্টি কলায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। বিগু তাঁর ভৃত্য হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান ছিল এবং রাজার অর্জিত বিদ্যার কিছু কিছু আয়ত্ত করেছিল।

ছাত্রজীবন শেষ হলে বিক্রমজিতের সঙ্গে এক অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যার বিবাহ হল। তারপর রাজকন্যা বড় হয়ে উঠলে বিক্রমজিৎ তাঁর শ্বশুরের প্রাসাদে গেলেন রাজকন্যাকে আনতে। বিগুও গেল তাঁর সঙ্গে।

ফেরার পথে ওঁরা একটা সুন্দর জায়গায় এলেন। সেখানে কিছু লোক আমোদ-প্রমোদ করছিল। তখন বসন্তকাল—অশোক, পলাশ, শিমুল ফুল ফুটেছে ঝাঁকে ঝাঁকে—আর মহুয়া ফুলের নেশা-ধরানো গন্ধে ভরে গেছে চারদিক। ছেলেরা বাঁশী বাজাচ্ছে আর সুন্দরী তরুণী মেয়েরা নাচছে। রাজা বিক্রমজিতের এই আনন্দমেলায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা হল। কিন্তু তিনি যে রাজা—প্রাকৃতজনের সঙ্গে কেমন করে যোগ দেবেন তিনি। রাজা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চট করে তিনি একটি টিয়াপাখীর রূপ ধরে ওদের সঙ্গে মিশে গেলেন। রানীর পাশে পড়ে রইল ওঁর নিজের শরীর।

বিগু বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও লোভের শিকার হল। রাজার শরীরে প্রবেশ করে রাজার মত জীবন কাটাবার ইচ্ছা হল তার। যখন রাজা টিয়াপাখী হয়ে নাচ-গান উপভোগ করতে লাগলেন তখন বিগু রাজা সেজে রাজপ্রাসাদে ফিরে এল তরুণী রানীর সঙ্গে। কেউ কিছুই

জানল না, বিগু সিংহাসনে বসে রাজকার্য চালাতে লাগল। কিন্তু রানী তো দেখেছেন রাজা বিক্রমজিৎ নিজের দেহ ফেলে রেখে টিয়াপাখী হয়ে চলে গেছেন। তাই তিনি একে স্বামী হিসাবে মেনে নিলেন না এবং একটা ব্রতপালনের ছলে আলাদা হয়ে রইলেন।

এদিকে টিয়াপাখীটিকে একজন পাখীধরা ধরে ফেলেছে। সে পাখীটিকে মারতে উদ্যত হলে পাখী বলল 'আমাকে মেরো না, আমাকে রাজার কাছে নিয়ে চল। আমি নিজের দাম নিজেই ঠিক করে বিক্রী হয়ে তোমাকে বড়লোক করে দেব।' তখন পাখীধরা রাজাকে গিয়ে বলল, "মহারাজ এ এক আশ্চর্য পাখী।" রাজা পাখীর পরীক্ষা নিলেন। টিয়াপাখী অনেক ধাঁধাঁ, সমস্যা এমন কী কূট রাষ্ট্রনীতির প্রশ্নেরও উত্তর দিল। রাজা খুবই খুশী হলেন, তারপর পাখীধরার কথামত রাজা পাখীকে তার দাম জিজ্ঞাসা করলেন, পাখী নিজের দাম চাইল এক লাখ টাকা। রাজা কোষাধ্যক্ষকে এক লাখ টাকা এনে পাখীধরাকে দিতে বললেন। পাখীধরা এত টাকা পেয়ে ভীষণ অবাক হয়ে গেল।

রাজকুমারীর পাখীটিকে ভারী ভাল লাগল তাই তিনি নিজের শয়নকক্ষে পাখীটিকে রাখলেন।

এদিকে রাজার কাছে তাঁর প্রজা একজন বণিক একটা সমস্যার সমাধানের জন্য এল। সেই বণিকের এক পুত্র। সেও বাণিজ্য করত। সে দেশ-বিদেশে গিয়ে প্রচুর ধন উপার্জন করেছিল। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। সে আবার বেরল বাণিজ্য করতে। এবারে বহুবছর চলে গেল সে আর ফিরে এল না। বণিক তার পুত্রের আশা যখন ছেড়ে দিয়েছেন তখন সে একদিন ফিরে এল।

তখন তার পিতামাতা ও স্ত্রী তাকে উচ্ছ্বসিত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করল। ঠিক সেই সময় আর একজন লোক এল বণিকপুত্রের মতো চেহারা করে। সে এসে দাবী করল সে-ই বণিকের পুত্র। বণিক ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেলেন। দুজনের মধ্যে সত্যিই কে তাঁর পুত্র। তখন তিনি রাজসভায় এলেন সত্য নিরূপণের জন্য। রাজা তাঁর পারিষদ ও পণ্ডিতদের সাহায্য চাইলেন কিন্তু কেউই আসল বণিক পুত্র কে সেটা স্থির করতে পারলেন না। শেষকালে টিয়াপাখিটির সাহায্য নেওয়াই স্থির হল। টিয়াপাখি বলল, তোমাদের মধ্যে যে একটি শিশির ভিতর ঢুকতে পারবে সেই প্রকৃত বণিক পুত্র। যে লোকটি দ্বিতীয়বারে এসেছিল সে বলল, তোমার বিচারই আমি মেনে নেব কারণ তুমি খুব জ্ঞানী! তারপর একটি ক্ষুদ্র কীটের দেহধারণ করে সে শিশির ভিতর ঢুকে পড়ল। পাখি তখনই শিশির মুখ বন্ধ করে দিতে বলল। শিশির মুখ বন্ধ করে দেওয়ার পর টিয়াপাখি বলল, এ একটা অশুভ প্রেত তাই যেমন খুশী রূপ ধরতে পারে। প্রথম যে এসেছে সেই আপনার পুত্র।

এই কাহিনী মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল টিয়াপাখির খ্যাতি। রাজা বিক্রমজিতের রানীও শুনতে পেলেন এই আশ্চর্য পাখির কথা। আর তাঁর মন বলল "এ আমার রাজা বিক্রমজিৎ ছাড়া আর কেউ নয়।" রানীর বড় সংকট, বিগুর হাত থেকে কী তাঁর মুক্তি হবে? বিগু রাজার শরীরে প্রবেশ করে নিজেকে তাঁর স্বামী বলে দাবী করে। রানী তখন রাজকুমারীকে একখানি চিঠি লিখে সব জানালেন আর অনুনয় করে বললেন টিয়াপাখিটিকে তাঁর শয়নকক্ষে পাঠিয়ে দিতে। রাজকুমারী একটি

শর্তে পাখিটিকে ছাড়তে রাজি হলেন—যে তিনি রাজাকে বিবাহ করবেন। রানী সম্মতি দিলেন। টিয়াপাখিটি রানীর শয়নগৃহে ঠাঁই পেল। রানী সেই রাত্রে 'সোল্হ সিংগার' করে সুসজ্জিতা হলেন। পালঙ্কে ফুলের মালা ঝুলিয়ে দিলেন বিছানায় ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিলেন। জানলা দরজা রঙীন কাগজের মালা দিয়ে সাজালেন। বিণ্ড রানীর এই পরিবর্তনে খুবই খুশী হল আর জিজ্ঞাসা করল কেন রানীর আজ এত আয়োজন। রানী বললেন আজ আমার ব্রত সাঙ্গ হল, আজ আমরা একসঙ্গে রাত্রিযাপন করব। কিন্তু রাজপরিবারের নিয়ম অনুযায়ী মহারাজকে ভেড়ার রূপ ধারণ করে থাকতে হবে এই রাত্রে। যেই বিণ্ড রাজার শরীর ত্যাগ করে ভেড়ার রূপ ধারণ করল অমনি রানী খাঁচা খুলে টিয়াটিকে বার করে দিলেন আর রাজা তাঁর নিজের শরীরে প্রবেশ করলেন।

না, রাজা বিক্রমজিৎ তাঁর আবাল্য সহচর ভৃত্যকে প্রাণদণ্ড দিলেন না কিন্তু ওকে চিরদিন ভেড়ার রূপেই জীবন ধারণ করতে হল কারণ বনের মধ্যে বহুকাল পরিত্যক্ত ওর নিজের দেহটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

তিনিই সেই রাজা বিক্রমজিৎ 'বৈতাল পচ্চিশী' আর 'সিংহাসন বত্তীসী' গল্পগুচ্ছের মধ্যে অমর হয়ে আছেন।

লক্ষীমন্ত স্ত্রী

বিহারের কোন এক গ্রামে ছিলেন এক গরীব ব্রাহ্মণ। তার ব্রাহ্মণী অতিকষ্টে খেটে খুটে কোনরকমে দুজনে সংসারটা চালাতেন।

একদিন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বললেন 'আপনি সব প্রতিবেশীদের বলুন তো সারাদিনের যা কিছু জঞ্জাল আমাদের দোরগোড়ায় ফেলতে'। ভারী অদ্ভুত এই পরামর্শ। কিন্তু ব্রাহ্মণের নিজের স্ত্রীর ওপর খুব ভরসা ; তাই তিনি ঘুরে ঘুরে প্রতিবেশীদের বলে এলেন কথাটা। জঞ্জালের মধ্যে একটা কালো মরা সাপও ছিল।

এদিকে এক ধনী বণিকের স্ত্রী গহনা পরতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর একছড়া চন্দ্রহার ছিল অলঙ্কারের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। নদীতে স্নান করার সময় পাছে হারটি হারিয়ে যায় তাই তিনি ওটি নদীর ধারে রেখে স্নানে নামলেন। একটা চিল এসে হারটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। চন্দ্রহারটা নিয়ে উড়ে যাবার সময় চিলটার চোখে পড়ল মরা সাপটা, তখনই চিলটা হার ফেলে দিয়ে সাপ নিয়ে উড়ে গেল।

বণিক ঢোল সহরৎ করে ঘোষণা করলেন যে চন্দ্রহারটি উদ্ধার করে দিতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

ব্রাহ্মণ দেখলেন জঞ্জালের মধ্যে দামী হারটি পড়ে রয়েছে—লোভে তার চোখদুটো চকচক করে উঠল। কিন্তু ব্রাহ্মণী হারটি তার মালিককে ফেরৎ দেবেনই।

ব্রাহ্মণী স্নান সেরে কৃষ্ণের নিত্য পূজা করলেন। তারপর একখানি হলুদরঙের শাড়ি পরে পেতলের থালায় চন্দ্রহারটি নিয়ে বণিকের দ্বারে করাঘাত করলেন। বণিকের স্ত্রী হার ফিরে পেয়ে খুশিতে উপচে পড়লেন। তখন বণিক ব্রাহ্মণীকে কিছু পুরস্কার দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণী বললেন, 'হুজুর আপনি যদি তিন সত্যি করেন যে, আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না, আর আমি যা চাইব দেবেন তাহলেই আমি কিছু চাইব।

বণিক প্রশ্রয়ের হাসি হেসে তিন সত্যি করলেন। তখন ব্রাহ্মণী বললেন কথা দিন যে, দেওয়ালীর রাত্রে আপনার বাড়ি এবং অন্য কোন বাড়িতেই আলো জ্বলবে না শুধু আমার বাড়িতেই আলো জ্বলবে। বণিকের প্রস্তাবটা পছন্দ হল না কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভাঙতে পারলেন না। কথা দিলেন।

তারপর দেওয়ালীর রাত্রে ব্রাহ্মণী নিজের বাড়ির চারদিকে বিস্তর আলো জ্বালিয়ে রাখলেন আর দরজা রাখলেন ভালো করে বন্ধ। প্রতি বছর দেওয়ালীর রাত্রে লক্ষ্মীদেবী তাঁর স্বর্গের আবাস ছেড়ে নেমে আসেন আলোকিত ধূলার ধরণীতে। কিন্তু এবারে এসে দেখলেন সমস্ত গ্রাম অন্ধকার। যেখানে আলো সেই বাড়ির দরজায় করাঘাত করলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী দরজা না খুলে বললেন, 'লক্ষ্মীদেবী মাগো আমাদের বাড়িতে এসো না আমরা বড় গরীব। তোমার পূজা করার ক্ষমতা নেই আমার'। দেবী অন্য কোন বাড়ি খুঁজতে গেলেন কিন্তু সব যে অন্ধকার। আবার ফিরে এলেন ব্রাহ্মণীর কাছে। এখন তিনি ব্রাহ্মণীকে দরজা খোলার জন্য অনুনয় করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী টললেন না। তিনি বললেন, 'তবে বল মা যে তুমি আমায় দুহাত ভরে ঐশ্বর্য দেবে আমি প্রাণভরে তোমার পূজা করব।' মা লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়ে বললেন "তাই হবে বাছা তোমার অগাধ ধনাগম হবে। তুমি চিরদিন প্রাচুর্যের মাঝে দিন কাটাবে।" লক্ষ্মীদেবী ব্রাহ্মণীর গৃহে প্রবেশ করলেন।

তারপর গরীব ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সংসার উথলে উঠল ধনৈশ্বর্যে। ধর্মভীরু ভক্তপ্রাণ দুজনে সুখে জীবন কাটাতে লাগলেন।

তিন অন্ধ রানীর পুত্র

অনেককাল আগে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একটা বাজার ছিল। প্রজাদের ওপর আদেশ ছিল যে-জিনিস বিক্রি হবে না দিনের শেষে তা রাজার কাছে জমা দিতে হবে। একদিন হল কি একজন একটা রাক্ষসীর মুর্তি গড়ে এনেছিল সেটা কেউ কিনল না।

সন্ধ্যাবেলা সেই মূর্তিটি সে রাজার কাছে জমা দিতে এল। রাজা নিজের আদেশ অনুযায়ী মূর্তিটি নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু যেই লোকটি মূর্তিটি বিক্রি করে চলে গেল অমনি মূর্তিটি একটি জীবন্ত রাক্ষসীতে পরিণত হল। রাজা তো ভয়ে কাঁটা। রাক্ষসী বলল "আমি এখানেই মহারাজের রানী হয়ে থাকব মহারাজের প্রাসাদে।" রাজার তো এদিকে তিনজন রানী আছেন তাদের কী হবে। রাক্ষসী হুকুম দিল রাজাকে তিন রানীর চোখ উপড়ে তাদের গহন বনে নির্বাসন দিতে। মর্মাহত রাজা ভয়ে তাই করলেন।

তিন অন্ধ রানী তাদের একমাত্র পুত্রকে নিয়ে বনে চলে গেলেন। তাঁদের পুত্র কুল, আম, লিচু এবং অন্য যা ফলমূল বনে পেত তাই নিয়ে আসত। আর তাঁরা একটি পিপল গাছের নীচে বসবাস করতেন।

একদিন রাজপুত্র বনে ঘুরতে ঘুরতে একজন বুড়ীর দেখা পেলেন। বুড়ী একখানি কুটিরে বাস করত। রাজপুত্রের বুড়ীকে ভালো লেগে গেল। সেখানে কিছুদিন সে রয়ে গেল। বুড়ী তাকে গরম দাল আর চাপাটি খাওয়াত আর বলত 'আমি তোমার ঠাকুমা।'

বুড়ীর বাগানে একদিন রাজপুত্র দেখল, দুটি চোখ ঝুলছে। সে

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল 'এ কাদের চোখ ?' বুড়ী বলল 'এ তোমার মায়েদের চোখ, আমার মেয়ের হুকুমে তুলে নেওয়া হয়েছে।' 'এ চোখ কেমন করে আবার মায়েদের চোখের গর্তে বসিয়ে দেওয়া যাবে ?' 'একরকম ধান আছে যেদিন বুনবে সেদিনই তুলবে। সেই ধানের চালের মণ্ড দিয়ে যদি চোখগুলি গর্তে বসিয়ে দাও তাহলে তোমার মায়েরা আবার দেখতে পাবে।

রাজপুত্র বুড়ীর বাড়ি ছেড়ে সেই ধানের খোঁজে বেরোল।

বনের পর বন পেরিয়ে গেল সে। দেখা হল অনেক হরিণের সঙ্গে, বাঘের সঙ্গে আর নানাধরনের পাখিদের সঙ্গে। তারপরে পেল সেই ধানের ক্ষেত। সে ধানের পাঁচটি শিষ নিল।

মায়েদের কাছে ফিরে এসে সে ধানের চারটে শিষ চাল সিদ্ধ করল। একটি ধানের শিষ সে বপন করল। তারপর যেই সে মায়েদের চোখের গর্তে ছটি চোখ বসিয়ে দিল অমনি তার ধানের খেত হু হু করে বেড়ে গেল। অনেক বলদ দিয়ে জমি চাষ করে অনেক ধান ঘরে তুলল। সেই ধান বিক্রী করে ওর অনেক ধনদৌলত হল। বিশাল অট্টালিকা হল ওর। সেখানে মায়েদের নিয়ে ও সুখে বাস করতে লাগল।

রাজপুত্র আবার বুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। বুড়ীর কাছে সে জানতে চাইল তার পিতা কোথায়। বুড়ীর সঙ্গে কথা বলার সময় সে তিনটি সিন্দুর কৌটা দেখতে পেল। বুড়ী রাজার রাজ্য কোনদিকে রাজপুত্রকে বলে দিল।

সিন্দুর কৌটার ভিতর কী আছে জিজ্ঞাসা করল রাজপুত্র। বুড়ী বলল "ও কৌটা খুল না খবরদার। ওর মধ্যে যে ভোমরা আছে

ওগুলো হচ্ছে আমার আর আমার মেয়ের প্রাণ ভোমরা। এই ভোমরা যদি মরে যায় আমরা বাঁচব না।" চতুর রাজপুত্র চুপে চুপে কৌটাগুলি নিয়ে সরে পড়ল আর ভোমরাগুলোকে মেরে ফেলল। বুড়ী আর বুড়ীর মেয়ে দুজনেই তো রাক্ষসী, ভোমরা মারা যাওয়া মাত্রই ওরাও বিকট চিৎকার করে ধপাস করে পড়ে মরে গেল।

তারপর রাজপুত্র তার তিন মাকে নিয়ে পিতার রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

রাজা আনন্দে কাঁদতে লাগলেন। রাজপুত্রকে আলিঙ্গন আর রানীদের সসম্মানে প্রাসাদে ঠাঁই দিলেন।

তারপর সবাই চিরদিন সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

সাত বৌ

অনেককাল আগের কথা। বিহারে এক বণিক ছিল। তার নাম ছিল মণিলাল। মণিলালের ছিল সাতটি ছেলে। যথা সময়ে মণিলাল ছেলেদের বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ আনল। তারপর বৃদ্ধবয়সে নিজের ব্যবসাপত্র ছেলেদের বুঝিয়ে দিয়ে মণিলাল মারা গেল। বিয়ের পর কিছুদিন সুখে সংসার করার পর সাতভাই বিদেশে গেল দোকানের জন্য জিনিসপত্র কিনতে। নিজের স্ত্রীদের মায়ের কাছে রেখে গেল তারা।

মাসকয়েক পরেই সাতটি বৌয়ের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। শাশুড়িকে কিছুতে খুশি করতে পারে না ওরা। সকালবেলায় আঁচল ভরে ফুল এনে দেয় তাঁর দেবতার পূজার আয়োজনে। সন্ধ্যেবেলা

নরম হাতে তাঁর পা টিপে দেয়। মল্লিকা ফুলের মত নরম আর সাদা বিছানা পেতে দেয় তাঁর বিশ্রামের জন্য। তবু তারা শাশুড়ির মন পায় না।

তখন তারা ঠিক করল চলে যাবে। যে দিকে দু'চোখ যায় তারা চলে যাবে। সকালে উঠেই বড় বৌ বলল, "মা তুমি তো ছোলার শাক খেতে ভালোবাস। আজ তুলে আনো না খানিকটা তোমাকে রান্না করে দিই। বুড়ীর বেশ খাওয়ার লোভ ছিল। সহজেই রাজি হয়ে গেল। নিজেদের খেত থেকে শাক তুলে আনতে বুড়ি বেরুল বাড়ির বাইরে। এদিকে এরা পরামর্শ করতে লাগল কিভাবে কখন পালাবে। বড়বৌয়ের বুদ্ধি খুব, সে বলল, "টাকা পয়সা তো সবই মায়ের কাছে। খাবার জন্য তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা প্রত্যেকে এক কলসী করে ছাতু নেব সঙ্গে।" সাত কলসী ছাতু ভরে সেই কলসীগুলো ওরা চুপি চুপি একটা কুমোরের পাঁজায় রেখে এল। কুমোর দেখে ফেলল। সাতটা কলসীতে কি না জানি সোনাদানা আছে তাই দেখবার জন্য কুমোরের প্রাণ আনচান করে উঠল। কলসী খুলে দেখে সোনাদানা কিছুই নেই, আছে কলসীভরা টাটকা মিষ্টি গন্ধের ছোলার ছাতু। কুমোরের জিভে জল এসে গেল। সে ছ'টা কলসীর ছাতু ঢেলে নিয়ে ছাই ভরে দিল।

এদিকে সাত বৌ রাত্রে শাশুড়িকে হিং-এর কচুরি, চাটনি, ছোলার শাকভাজা খাইয়ে সন্তুষ্ট করে পায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারপর পাছে শব্দ হয় এই ভয়ে পায়ের মল খুলে রেখে, ঘোমটায় মুখ ঢেকে ছাতুর কলসী কাঁখে নিয়ে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সাত বৌ অনিশ্চিত যাত্রায়।

গহন বনে গিয়ে একটি আমগাছের তলায় ওরা ক্লান্ত হয়ে বসল। ওদের খিদে পেয়েছে। ছাতুর কলসী খুলে ওদের চক্ষুস্থির। এ যে ছাই ঠাসা। শুধু ছোট বৌয়ের কলসীতে ছাতু আছে। সাত বৌ ওরা ছিল সাতটি বোনের মত। ছোট বৌ তার ছাতু সবার সঙ্গে ভাগ করে খেল। খানিকটা ছাতুমাখা উদ্বৃত্ত হল সেটা ওরা রেখে দিল গাছের তলায়। আহা! পশুপাখীরা খাবে। ওরা যেই হাঁটতে আরম্ভ করেছে অমনি সেই ছাতুর ডেলাটি হয়ে গেল একটি নাদুস-নুদুস চেহারার হৃষ্ট চাউনির ছেলে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। তুমি কে গো? ওরা জিজ্ঞাসা করল। আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো। বায়নার সুরে বলে সে। চলো, তোমাকে আমরা ডাকব ঢুনিঢরাম বলে। বলল বড় বৌ।

সেই থেকে ঢুনিঢরাম রইল ওদের সঙ্গে। ওরা চলেছে। মুখ রোদে রাঙা। চুল রুক্ষ। উড়ছে বাতাসে। পা আর চলে না। সামনে পড়ল সুন্দর কুটির। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কুটিরের সামনে একটি লিচুগাছ। লাল টুকটুকে চুনিরঙ লিচু রসে টসটসে। বিকালের সোনারোদ পড়েছে লিচুগাছের গায়ে। এখানে যদি থাকতে পেতাম আজ। ভাবছে সাতটি বৌ। ঠিক সেই সময় এক বুড়ী পেঁজা তুলোর মত তার চুল, হাড় জিরজিরে চেহারা। এসে দাঁড়াল কুটিরের ভেতর থেকে। ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, "বাছারা কোথায় যাচ্ছ গো। আহা মুখ যে রাঙা হয়ে গেছে সব, রোদ লেগেছে বড়, না? এস বাছারা একটু বস।" সাত বৌ গলে গেল যেন। আহা! এমন আদর কতদিন পায়নি তারা। তারা বুড়ীর বাড়িতে গেল। বুড়ীর কাছে ওরা থাকবে আজ। বুড়ীর কথা কী স্নেহমাখা। ঢুনিঢরাম

ছটফটে ছেলে চারিদিকে উঁকিঝুঁকি মারছে।

হঠাৎ ফিসফিস করে বলল "দিদিরা খুব সাবধান। বুড়ী কিন্তু ডাইনী।" "তুই কি করে জানলি?" "মেয়েদের বলেছে কিনা, তোমাদের জন্য মোটা মোটা রুটি করতে বিষ দিয়ে ঠাসা। রুটি তোমরা খেও না যেন। ওকে খুব তোয়াজ কর, মাসি মাসি বলে ডাক। রুটি খেও না যেন।"

বুড়ি রুটি দিয়ে চাটনি দিয়ে শালপাতায় সাজিয়ে বলে "খাও বাছারা খাও।"

বড় বৌ বলে "আমি খাব না মাসি, আমার দাঁত কনকন করছে।"

মেজ বৌ বলে, "আমি খাব না মাসি, আমার জিভ চনচন করছে।"

সেজ বৌ বলে "আমি খাব না মাসি, আমার পিঠ ঝনঝন করছে।"

ন বৌ বলে "আমি খাব না মাসি, আমার হাত টনটন করছে।"

ফুল বৌ বলে "আমি খাব না মাসি, আমার চোয়াল চিনচিন করছে।"

রাঙা বৌ বলে "আমি খাব না মাসি, আমার কান ঝিনঝিন করছে।"

ছোট বৌ বলে "আমি খাব না মাসি, আমার গা ঘিনঘিন করছে।"

ডাইনী বুড়ী রেগে গেল। তবে সহজে শিকার ছাড়তে রাজি নয় সে। মুখ ভার করে বলল "তবে যাও ঘুমিয়ে পড়গে যাও।" ঘরে ঢুকে ওরা দেখল দেওয়ালের গায়ে তিনটে থলি ঝুলছে—একটা সাদা, একটা নীল, একটা লাল। "মাসি গো মাসি, সোনার মাসি।" রিন-রিনে গলায় ডাকে ছোট বৌ। "কি মা?" ডাইনি আদর দেখিয়ে বলে। "তোমার এই থলিগুলোয় কি আছে গো? আমাদের দেখাও

না একটু।”

বুড়ী বলল, “ঐ সাদা থলিতে ধরা আছে জলের বন্যা, ঐ নীল থলিতে ধরা আছে ঝোড়ো মেঘ—আর ঐ লাল থলিতে আগুন।”

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বুড়ী আর বুড়ীর মেয়েরা। যারা তালগাছের মত লম্বা, পাহাড়ের মত মোটা। যাদের চুল সাপের ফণার মত। যাদের দাঁত মূলোর মত। যাদের রঙ মেঘের মত কালো। বুড়ীর সেই সাত মেয়ে।

ঢুনিঢরাম চুপিচুপি এসে বলে “দিদিরা ওঠ, পালাও।” সাত বৌ উঠে পড়ে। সেই তিনটি থলি তারা সঙ্গে নেয়। ঢুনিঢরাম অতটুকু ছেলে কিন্তু তার গায়ে কী প্রচণ্ড জোর! বুড়ীর মেয়েদের তুলে এনে সাত বৌ-এর জায়গায় শুইয়ে দিল।

ওরা চলেছে। বুড়ী এদিকে ভাবল, সাতটা বৌকে কেটে খাওয়াবে মেয়েদের, খাবে নিজে—মানুষের মাংসের ভোজ অনেকদিন হয়নি। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এসে বসিয়ে দিল ছুরি বড় বৌ-এর গলায়, আবার বসাল ছুরি মেজ বৌ-এর গলায়, আঁজলা ভরে রক্ত খেল। এমনি করে সবাইকে সাবাড় করল। হঠাৎ চোখ পড়ল ওদের মুখের ওপর। বুড়ী শিউরে উঠল। কাদের রক্ত খেল সে আঁজলা ভরে এতক্ষণ? এ যে সব তারই মেয়ে। রাগে অন্ধ হয়ে ছুটল বুড়ী।

বুড়ী ছুটছে। তার পেঁজা তুলোর মত চুল উড়ছে। তার গোল-গোল চোখ ভাঁটার মত বনবন করে ঘুরছে। বুড়ী ছুটছে লম্বা লম্বা বাঁশের মত পা ফেলে। শীর্ণ লম্বা হাত বাড়িয়ে, তীক্ষ্ণ লম্বা নখ মেলে বুড়ী ছুটছে।

সাত বৌ তখন খুলে দিল জলের থলি। বইল বন্যার ধারা খলখল করে। জল চলল বুড়ীকে ভাসিয়ে নিয়ে। বুড়ী সাঁতার কাটছে। বুড়ী এগিয়ে আসছে। এই বুঝি ধরে ফেলল। এবার ওরা খুলে দিল ঝোড়ো মেঘের থলি। গরুড়ের মত ডানা মেলে দিল কালো মেঘ। আকাশ ছেয়ে গেল। আরম্ভ হল ঝড়ের মাতন। বুড়ীকে উড়িয়ে নিয়ে গেল ঝড়। বুড়ী আছড়ে পড়ল গাছতলায়। উঠে পড়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। তার চোখ পড়ছে ঠিকরে। চুল উড়ছে। বুড়ী ছুটছে। এবার আর নিস্তার নেই বুড়ীর হাত থেকে। সাত বৌ কেঁদে ফেলল। বুড়ী ডাইনি এবার ওদের ধরবে—গলা কেটে রক্তপান করবে। ঢুনিঢরাম তখন বলল "দিদি তোমরা এবার খুলে দাও আগুনের থলি"—এবার লক্‌লকে আগুনের শিখা ঝাঁপিয়ে পড়ল বুড়ীর ওপর। বুড়ী একটা বিকট চিৎকার করে উঠল। আগুনে পুড়ে বুড়ী ছাই হয়ে গেল।

আবার হাঁটছে সাত বৌ সঙ্গে আছে ঢুনিঢরাম। অনেক বন পেরিয়ে পাহাড় নদী পেরিয়ে ওরা থামল একটা বাড়ির সামনে, দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে দেওয়ালে আঁকা রামচন্দ্রের অভিষেকের ছবি। সীতার অগ্নি পরীক্ষার ছবি। নিঝুম বাড়ি। কে থাকে কে জানে। ঢুনিঢরাম হাঁকল "কে আছ হে।" বেরিয়ে এল এক সম্ভ্রান্ত হনুমান। হাত জোড় করে বলল "মায়েরা কোথা থেকে আসছেন?" বড় বৌ বলল "আমরা পথশ্রমে ক্লান্ত আজ এখানে বিশ্রাম করতে দেবেন?" হনুমান তখনই রাজী। সসম্মানে সাত বৌকে বাড়ির ভিতর পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। তারপর হনুমান বন থেকে কাঠকুটো আনে, ফলমূল আনে, তরিতরকারি আনে সাত বৌ রান্নাবান্না করে সবাই খায়। বেশ থাকে।

এমনি করে একবছর কেটে গেল। এমন সময় একদিন সাতজন পথশ্রান্ত পথিক এল হনুমানের বাড়িতে। হনুমান সব যোগাড় করে দিল। সাত বৌ পঞ্চব্যঞ্জন রান্না করে দিল। পথিকরা খেতে বসল। সাত বৌ ছাতে দাঁড়িয়ে ওদের খাওয়া দেখতে লাগল। অনেক কালের চেনা মুখ চোখে এসে গেল। জল পড়ল ঝরে পথিকদের গায়ে। আর ওরা চেয়ে দেখল ওদেরই সাত বৌ।

অবাক হয়ে গেল ওরা। কোনোমতে খাওয়া শেষ করে ওরা চাইল সুখাদ্যের রাঁধুনী যারা তাদের দেখতে। বৌদের মুখে সব কথা শুনে ওরা সাতটি ডোলা আনল, ফুল দিয়ে সাজান। বৌদের নিয়ে সাতভাই বাড়ি ফিরে এল।

এতদিন পরে হারানো বৌদের ফিরে পেয়ে শাশুড়ির মন গলে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন সোনার পুতলি বৌদের আর কখনো তিরস্কার করবেন না।

আর ঢুনিঢরাম! সে সাত বৌয়ের তৈরী লাড্ডু পেঁড়া খেয়ে, খেলে বেড়াতে লাগল।

ছঠি ব্রতের গল্প

অনেককাল আগে ছিল এক শাশুড়ি আর তার বৌ। শাশুড়ি ছিল বেজায় কৃপণ। শাশুড়ির ছিল বিরাট ক্ষেতখামার আর ফলের বাগান, কিন্তু গরীব প্রতিবেশীদের কখনই সে একটুও কিছু দিয়ে সাহায্য করত না। ওর বৌ এই কৃপণতা মোটেই পছন্দ করত না, কিন্তু ভয়ে কোন প্রতিবাদও করতে পারত না।

সেটা ছিল ছঠি ব্রতের আগের দিন। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে এই ব্রত পালন করা হয় বিহারে। মেয়েরা সব পরদিন পূজার জন্য ফল সংগ্রহ করছিল। বিহারের গ্রামে গরীব ঘরের মেয়েরা সম্পন্ন গৃহস্থের বাগান থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে আনে। এটাই রীতি। তাই মেয়েরা এই কৃপণ শাশুড়ির আখের ক্ষেত থেকে একটু আখ সংগ্রহ করতে এল।

পরদিন খুব ভোরে সবাই উঠবে। তারপর একটি থালিতে (থালায়) নারকেল, আখ, শশা, কুল, কলা এবং কিছু ফুল সাজিয়ে নিয়ে নদীর হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে মুখ করে সূর্যদেবের বন্দনা করবে।

কৃপণ শাশুড়ি পঞ্চমীর সন্ধ্যায় তার আখক্ষেত পাহারা দিতে লাগল। সব মেয়েরা এক-এক টুকরো আখ না পেয়ে শুকনো মুখে ফিরে গেল।

পরদিন ভোরে পুত্রবধূকে পাহারা দিতে রেখে সে নিজে গেল পূজা দিতে। পুত্রবধূ কাউকেই বাধা দিল না। সকলেই এক টুকরো আখ নিয়ে গেল। তারপর সে তার নিজের পূজার জন্য কয়েক টুকরো আখ সংগ্রহ করল। অমনি সব আখ সোনার টুকরোয় পরিণত হল। সে তো ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। তখন আকাশ থেকে দৈববাণী হল "বাছা ভয় পেও না। এই সোনার আখ তুমি বাড়িতে নিয়ে যাও। সম্পদে প্রাচুর্যে বাস কর চিরদিন। আমি সূর্যদেব তোমাকে আশীর্বাদ করছি তোমার ঘর সন্তান-সন্ততিতে ভরে উঠবে।" তখন মেয়েটির শরীর থরথর করে কাঁপছে, চোখে ঝরছে অবিরল আনন্দাশ্রু। বাড়িতে সোনার আখের স্তূপ দেখে কৃপণ শাশুড়ির চোখ লোভে চকচক করে উঠল। সে ছুটল ক্ষেতে আখ

তুলে আনতে। কিন্তু দেবতারা তার কৃপণতা ও লোভকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাই 'আখক্ষেতে' সে এক বীভৎসদর্শন স্ত্রীলোকে পরিণত হল। তার শরীর কুষ্ঠরোগে ভরে গেল। লোভের শাস্তি পেল কৃপণ শাশুড়ি।

নাগপঞ্চমী

অনেকদিন আগে এক পরিবারে ছিল সাতটি বউ। ছয় বউ ছিল ধনী পরিবারের মেয়ে। সপ্তম বউটি ছিল বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তার ছোটবেলাতেই তার বাবা-মা মারা যান।

একদিন ছয় বউ নাগপূজা করবে বলে মাটিতে গর্ত করতে করতে গল্প করছে নাগপঞ্চমীর দিন বাপের বাড়ি গিয়ে তারা কত সুখে থাকবে। সপ্তম বউ মণি চুপ করে রইল। বিহারের রীতি অনুযায়ী সব মেয়েরাই নাগপঞ্চমীতে বাপের বাড়ি যায়। শুধু মণিকেই থাকতে হবে শ্বশুরবাড়িতে।

মণির এত দুঃখ হল যে, সে একটা সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বলল "যদি আমাকে কালকেউটে ছোবল মারে—" ঐ গর্তে একটা কালকেউটে থাকত। মণির কথা শুনে তার চোখে জল এসে গেল। কালকেউটে তার মাকে গিয়ে বলল "মা তুমি যদি কিছু না বল তাহলে আমি আমার একটি বোন নিয়ে আসব।" সাপিনী মা তার ছেলেকে বলল "তাহলে তো তোর সৌভাগ্য। এটা হচ্ছে শ্রাবণ মাস। ভাইবোনদের পরস্পরকে স্নেহধারায় ভিজিয়ে দেওয়ার এই সময়। নাগপঞ্চমীর দিন ভাইবোনের স্নেহের বাঁধন দৃঢ় হয়। এই দিনটিতে

মেয়েরা নিজের হাতে নাগের মূর্তি গড়ে পূজা করে। যা তোর বোনকে নিয়ে আয়।"

কালকেউটে তখনই চলে গেল যেখানে ওরা সাতজন ছিল। ছ'জন তো দৌড়ে পালাল। শুধু মণি দাঁড়িয়ে রইল। কালকেউটেকে দেখে ওর মন খুশি হয়ে উঠল কারণ ও তো মরতেই চাইছিল তখন। নাগ তখন ওকে বলল "তোমাদের সব কথা শুনেছি আমি। আমি শপথ নিচ্ছি আজ থেকে আমি তোমার ভাই।"

মণি তো সাপের কামড় খেতে তৈরী ছিল, কিন্তু সাপের মুখে মানুষের ভাষা শুনে ভারী অবাক হল।

মণি খুব খুশি হয়ে বলল "সব মেয়েরা তোমার মূর্তি পূজা করবে। আমি তোমাকেই পূজা করব।" মণির চোখে আনন্দাশ্রু। তার নাগ ভাই তাকে বলল "বোন, আমার আজকের দিনটিকে মনে রাখার জন্য তোমায় আমি দেব মহামূল্য মণি। যখনই তুমি এই মণি হাতে আমাকে মনে করবে আমি তখনই আসব তোমার দুঃখে বিপদে সাহায্য করতে। তোমার জায়েদের গিয়ে বল ওরা বাপের বাড়ির লোক এসে নিয়ে যাবে বলে প্রতীক্ষা করুক—তোমাকে আমি এখনই নিয়ে যাব আমার সঙ্গে।"

মণি নাগলোকে সুখে দিন কাটাতে লাগল। ওরা কেউ চায় না মণি ফিরে যাক। একদিন মণির ইচ্ছা হল তার নাগ ভাইবোনদের খাওয়াবে। নাগমাতা একটি ঘণ্টা বাজাতেন আর তাঁর নাগসন্তানরা এসে দুগ্ধ পান করত। মণিও তাই করল। কিন্তু দুধ ছিল ভীষণ গরম তাই ওদের মুখ পুড়ে গেল আর ওরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু নাগিনী মা ওদের বুঝিয়ে মণিকে দংশন করা থেকে নিবৃত্ত করল। মণিকে হীরা, পান্না, নীলা, মুক্তা রাশি রাশি সঙ্গে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি

ফেরৎ পাঠাল।

ওর জায়েরা হিংসায় জ্বলে মরতে লাগল এবং ওকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগল। নাগভাই ওদের দংশন করতে উদ্যত হলে মণি অনেক মিনতি করে তাকে নিরস্ত করল। একদিন ওরা মণির সিন্দুকে একটা বিষধর সর্প ঢুকিয়ে রাখল। ওরা ভাবল হয় মণি সর্প দংশনে মারা যাবে না হলে মণিকে তার স্বামী সাপের সঙ্গে কথা বলতে দেখে সন্দেহ করবে।

মণির স্বামী স্নান সেরে একখানি কাপড় চাইলেন। মণি আলমারি খুলতেই সাপটি ফোঁস করে মণিকে ছোবল মারল। মণি তার নাগভায়ের দেওয়া মণিটি হাতে নিয়ে বলল,

“জিও মেরি নাগিন মাতা জিও বরস হাজার
ভাইয়া নাগনে লড় লড়িয়া তো বনয়া নওলখা হার।”
(নাগিনী মা আমার বেঁচে থাক বছর হাজার
ভাই আমার নাগ তুমি হয়ে যাও নওলখা হার)

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিষধর সর্প হয়ে গেল নওলখা হার। সামনে এসে দাঁড়াল মণির নাগভাই। সে বলল “কেন তুমি নিত্য এত কষ্ট সহ্য কর? তোমার সব জায়েদের আমি দংশন করি তুমি সুখে থাকবে।” মণি বলল, ‘নাগভাই তুমি যতদিন আছ আমার কোন বিপদ হবে না।’

মণির স্বামী তাকে এক পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখল। সন্দেহের বিষ ঢুকল তার মনে কিন্তু সে কিছু বলল না। রাত্রে মণিকে যেই ছুরিকাঘাত করতে গেছে অমনি বিষধর ভয়ঙ্কর কালকেউটে তার হাত শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল। সে হাত নাড়তে পারল না কিছুতে।

এমন সময় মণির ঘুম ভেঙে গেল। মণি সবই বুঝতে পারল। মণি নাগভাইকে অনুনয় করল স্বামীকে ছেড়ে দিতে। নাগভাই বলল, "ওকে আমি ছাড়ি কি করে বোন ও যে তোমাকে হত্যা করছিল।" মণির স্বামী তখন জিজ্ঞাসা করল "এ সব কি হচ্ছে?" মণি তখন স্বামীকে সব খুলে বলতে তার স্বামী নাগভায়ের কাছে ক্ষমা চাইল। ও যে তার শ্যালক। তখন তার নাগ-শ্যালক চিরকালের সর্পদংশন থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিল মণিকে।

তারপর মণি স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখে জীবন কাটাতে লাগল আর নাগরাজের আশীর্বাদে তার ধনসম্পদের অভাব রইল না।

সবচেয়ে বোকা কে

চারজন অতি বোকা লোক একসঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়েছে। ক্লান্ত হয়ে তারা একটা পিপল গাছের তলায় বিশ্রাম করছিল। তাদের একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য ও একজন কায়স্থ।

পরে আরেকজন লোক এসে ঐ গাছতলায় বসল। সে ওদের নমস্কার করল।

তখনই চারজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল লোকটি ওদের মধ্যে কাকে নমস্কার করেছে তাই নিয়ে। মুন্সীজি (কায়স্থ) বলল "ও আমাকেই নমস্কার করেছে।" পণ্ডিতজী (ব্রাহ্মণ) বলল "কখনই না ও আমাকে নমস্কার করেছে।" সিংহজী (ক্ষত্রিয়) বলল "না, না ও আমাকেই অভিবাদন জানিয়েছে।" শাহজী (বৈশ্য) বলল "আসলে ও সবাইকেই নমস্কার জানিয়েছে। যদি মনে সন্দেহ থাকে জিজ্ঞাসা

কর গিয়ে। "হাথ কঙ্গন কো আরসি ক্যা" (আরে হাতের কঙ্কন দর্পণে দেখে কী হবে?)"

সিংহজী রেগে উঠে বলল "দেখ তোমাদের গ্রাহ্য করে কে? আমি রাজপুত, সসম্মানে নমস্কারে আমার জন্মগত অধিকার।"

ঝগড়ার তিক্ততা বেড়েই চলল। তখন ঠিক হল লোকটিকেই ওরা জিজ্ঞাসা করবে সে কাকে নমস্কার করেছে।

লোকটা কিন্তু বুঝতে পেরেছে এরা নিরেট বোকা। সে বলল, "আমি কিন্তু আপনাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বোকা তাকেই নমস্কার করেছি। এখন আপনারাই বলুন আপনাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বোকা।" ওরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে সবচেয়ে বোকা সাব্যস্ত করতে লাগল। ঠিক হল প্রত্যেকেই নিজের বোকামির একটা গল্প বলবে।

পণ্ডিতজী মাথার পাগড়িটা ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে নিজের গল্প শুরু করল—আমার গল্পটাই আগে বলি। সেটা ছিল ভাদ্রের কৃষ্ণ-পক্ষের রাত। আমার স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে পিত্রালয়ে গেছেন। বাড়িতে আমি একা। আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছে। শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি মনে করলাম পত্র (পঞ্জিকা) দেখে একটা শুভ মুহূর্ত বার করে তবে চোর ধরার চেষ্টা করব। পত্র দেখলাম কিন্তু পরবর্তী পূর্ণিমার আগে কোন শুভমুহূর্ত নেই, আর এখন একেবারে অশুভ সময়। তাই আমি চুপ করে রইলাম, চোর আমার সর্বস্ব নিয়ে চলে গেল।

পূর্ণিমার রাত। আকাশ নির্মেঘ। শুভ মুহূর্ত এসে গেছে। আমি ঘরের বাইরে এসে উচ্চস্বরে চিৎকার করলাম "চোর! চোর"।

প্রতিবেশীরা সমবেত হল আমাকে সাহায্য করবে বলে। একটি লোক শহর থেকে কিছু টাকা উপার্জন করে বাড়ি ফিরছিল। প্রতিবেশীরা তাকে ধরল।

পরদিন সকালে রাজদরবারে বসেছেন রাজা। রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "এই সেই চোর?" আমি একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "চুরি কবে হয়েছে?" আমি বললাম "মহারাজ আট ন'দিন আগে। আমার সর্বস্ব গেছে।"

"তাহলে এতদিন পরে পূর্ণিমার রাতে 'চোর চোর' বলে চিৎকার করলে কেন?" "মহারাজ আমি পত্র দেখে শুভ মুহূর্ত বার করেছি। সেই শুভ মুহূর্ত চুরির রাত্রের এতদিন পরেই প্রথম পাওয়া গেল। শুভমুহূর্ত না পেলে তো কোন কাজ করতে পারি না।"

রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন "তুমি একটা গবেট, বোকা, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।" ধরে আনা লোকটিকে মুক্ত করে দেওয়া হল। তাহলে দেখছ স্বয়ং রাজা আমাকে বোকা বলেছেন, বিশ্বাস না হয় রাজার কাছে চলো।"

এবারে শাহজীর পালা—সে বলল "তুমি আমার চেয়ে বড় বোকা কি করে হলে? আমার ঘটনাটা শোন তবে। সেটা ছিল দেওয়ালীর রাত। লক্ষ্মীপূজা করলাম সেদিন। তারপর থালায় সব টাকা পয়সা রেখে আমার স্ত্রীর পাশে বসলাম। কারণ জানই তো দেওয়ালীর রাত্রে জুয়া খেলতেই হয় তাহলে সারা বছর কেমন চলবে জানা যায়। তাই স্ত্রীকে বললাম যে আমি জুয়া খেলতে যাব। কিন্তু স্ত্রী বলল যে, আমরা তো নিজেরাই খেলতে পারি জুয়া। তারপর আমরা দুজনে হাত মিলিয়ে বাজি ধরলাম যে প্রথম কথা বলবে সে হেরে যাবে। খানিকক্ষণ

পরে আমরা শুয়ে পড়লাম। তারপর মধ্যরাত্রে একজন চোর ঢুকে পড়ল আমাদের ঘরে। আমরা তখনো জেগেছিলাম। কিন্তু কে প্রথম কথা বলবে? যে কথা বলবে সেই তো বাজি হারবে। আমরা চুপ করে রইলাম। চোর আমাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে চলে গেল। কিন্তু চোরটা অত্যন্ত লোভী তাই সে ফিরে এল। সে আমার পোষাক খুলে নিল আমি চুপ করে রইলাম। তারপর আমার স্ত্রীর গলায় হাত দিয়ে যখন তার হাঁসুলী খুলে নিচ্ছে তখন সে চিৎকার করে উঠল "কথা বল, আমরা সর্বশান্ত হয়েছি। এখন মানসম্ভ্রম খোয়াতে বসেছি আমি, তবু তুমি চুপ করে আছ!" আমি বললাম "তুমি কথা বলে ফেলেছ, তুমি বাজি হেরে গেলে।" তখন আমার স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল "চুলোয় যাক তোমার বাজি। সব জিনিস লুঠ হয়ে গেল এখন আমার মানসম্ভ্রম নষ্ট হতে চলেছে তবু তোমার হুঁশ হয় না!" এমনি করে যখন আমরা ঝগড়া করছি তখন প্রতিবেশীরা এসে পড়েছে কী হয়েছে জানবার জন্য। যখন তারা জানল তারা বলতে লাগল সবই লুঠ হয়ে গেল আর এরা এত বোকা এখন নিজেরা ঝগড়া করছে। এখন বল কে বেশি বোকা।

এখন সিংহজীর পালা। সে বলল "আমি বারান্দায় বসে হুঁকো টানছিলাম। দেখলাম একজন কাবুলী ঘোড়ায় চড়ে আসছে। ঘোড়ার পিঠে কম্বলের বোঝা। আমি তাকে ডাকলাম। জিজ্ঞাসা করলাম সে ঘোড়াটি বেচবে কিনা। সে বলল "বেচব বটে কিন্তু এর অনেক দাম। এত দাম তুমি দিতে পারবে না। একমাত্র কোন রাজাই পারবেন এই ঘোড়া কিনতে।" আমি তাকে দাম জিজ্ঞাসা করলাম। সে হাজার টাকা দাম চাইল। আমি বললাম "তাই দেব।" আমি

তাকে ঘোড়াটাকে একটা খুঁটিতে বেঁধে রেখে যেতে বললাম। আমার সিন্দুক থেকে তাকে পাঁচশ টাকা দিয়ে বললাম সে যেন কম্বল বিক্রি করে এসে বাকি টাকা নিয়ে যায়। কাবুলী চলে গেল।

সে ঠিক দুদিন পরে এলো। আমি মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে তাকে কিছু টাকা দিলাম। বললাম এক সপ্তাহ পরে বাকি টাকা দেব। একটুক্ষণ চোখ বুঁজে থেকে বলল "এক সপ্তাহ তো হয়ে গেছে টাকা দাও। তখন আর একশ টাকাও যোগাড় করতে পারলাম না তাই ঐ কাবুলীকেই ঘোড়াটা বিক্রি করে তার একশ টাকা ঋণ শোধ করলাম। আমি ভাবলাম আমি বেশ কায়দায় ধার শোধ করেছি। কিন্তু যে একথা শুনল সে-ই একবাক্যে সবচেয়ে বোকা বলল আমাকে।"

এরপর মুনসীজি বলল "এবারে আমি কত বোকা সেটা বলি। আমি এখনও বুঝি না অবশ্য আমি যা করেছি সেটা বুদ্ধিমানের কাজ না বোকামি। আমার শ্বশুরবাড়ির থেকে হঠাৎ খবর এল যে, আমার শাশুড়ির খুব শরীর খারাপ। বাঁচার কোন আশা নেই। শেষ দেখা দেখতে হলে তখনই যেতে হবে। আমি তখন আমার গৃহিণী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে রওনা হলাম শ্বশুরবাড়ির দিকে। একটা নদী পার হতে হবে।" গৃহিণী বলল "একটা নৌকায় চড়ে চলুন আমরা নদী পার হই।" তখন আমি বললাম "কী বাজে বকছ? এখন একজন মাঝি ডেকে তার মর্জির উপর নির্ভর করে নদী পার হতে হবে? এ সবের দরকার কী? নদীর জল কতটা গভীর তা কী ভাবে মাপে আমি জানি। আমি এখনই নদীর জল মাপব। যদি দেখি নদীর জল তত গভীর নয় তাহলে নৌকা ছাড়াই নদী পার হব।" আমি তখন নদীতে

নেমে দেখলাম নদীর জল পায়ের পাতা পর্যন্ত। আর একটু এগোলাম, দেখলাম জল হাঁটু পর্যন্ত। আর একটু এগোলাম জল আমার উরু পর্যন্ত উঠল। আরও জলে নেমে গেলাম জল আমার বুক পর্যন্ত উঠে এল। আমি বললাম "চিন্তার কিছু নেই, জল হাঁটুর একটু উপরে। আমার হিসাবে তাই হল। চল আমরা নদী পার হই।" আমার স্ত্রী আমার কথা বুঝতে চাইল না। আমার খুব রাগ হল। আমি মুন্সী, হিসাব করাই আমার কাজ আর গৃহিণী তার জীবনটা রান্নাঘরে কাটিয়ে কিনা আমার হিসাবের ভুল ধরে? আমি ওকে খুব ধমকালাম আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে নদীতে যেতে বললাম। মাঝ নদীতে পৌঁছেই ছেলেমেয়েরা ডুবে গেল। ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে গিয়ে গৃহিণীও ডুবে গেল।

ওরা সবাই যখন ডুবে গেল, তখনও আমি কিন্তু নিশ্চিত যে আমার হিসাব ঠিক। আবার আমি জলের হিসাব করলাম। অঙ্কের ফল একই হল। আমি এখনও ভেবে পাই না কেন এমন হল—

লেখা জোখা জৈ্যও কে তৈ্যও
লড়কা লড়কী ডুবে ক্যৈও?

(হিসাব ঠিকই হল কিন্তু ওরা সব ডুবে গেল কেন?)

আগন্তুক আবার নমস্কার করে একটু হাসল। এবার সে তার মত বলল "মুন্সীজিই সবচেয়ে বোকা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আপনাদের সম্পত্তি গেছে কিন্তু ওঁর সমস্ত পরিবারটাই মারা গেল ওঁর বোকামির জন্য। কে না ওঁকে সসম্মানে নমস্কার করবে?"

চার বন্ধু আনন্দে বিগলিত হল। আগন্তুকও খুব খুশি। খুশি মনে তাদের পথচলা আবার শুরু হল।

উড়ন্ত গাছ

বিহারের কোন এক রাজ্যে ছিল চার রাজকুমার। তিনজনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট ভাইটির হয় নি। বড় ভাইরা যাচ্ছেন ভ্রমণে। জ্ঞান বাড়াবার জন্য। ছোট ভাই রইল তার বৌদিদের কাছে। বৌদিরা দেবরকে খুব স্নেহ করেন। তাই বড় তিন রাজপুত্র দেশ ছেড়ে বেরোলেন নিশ্চিন্ত হয়ে।

একদিন রাত্রে ছোট রাজকুমার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন প্রাসাদের সামনে যে শাল গাছটি ছিল সেটি নেই। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি। পরের দিন রাত্রে সেই একই জিনিষ দেখলেন। এই রহস্যের তো একটা ব্যাখ্যা চাই। তিনি একজন ছুতোরকে দিয়ে শালগাছটির গুঁড়িতে একটা গর্ত করিয়ে নিলেন। গর্তের মুখে একটা ঢাকনা লাগিয়ে রাখলেন। রাত্রে তিনি সেই ঢাকনাটি খুলে গর্তে ঢুকে গিয়ে ঢাকনাটি আবার লাগিয়ে দিলেন। একটি ছোট্ট ফাঁক দিয়ে রাজপুত্র দেখলেন তার বৌদিরা গাছের উপর উঠে বসে বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্র বলে গেলেন আর শালগাছটি উড়তে লাগল। রাজপুত্র বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন।

গাছটি গিয়ে থামল একটি প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারে। সেখানে বিয়ের উৎসব চলছিল। কাগজের মালা দিয়ে প্রাসাদ সাজানো হয়েছে, 'মাড়োয়া' খুব রঙীন কাগজে মোড়া, যুঁই ফুলের গন্ধে বাতাস মাতোয়ারা। সানাইয়ে বাজছে বসন্ত রাগ।

মেয়েরা বিয়ের গান গাইছে—

হম ন জায়েগ দহি বেচায়ে হে রাম
ছিকাহি লে লই রাধা দহি রে মটুকিয়া

কৃষ্ণ ঢোকাল আধি রাহিয়া—হে রাম
জো কৃষ্ণ মারত ফুল কেশরিয়া
সুরদাস প্রভু তুহার দরস কো
গোয়ালিনী রহিলি ছিপাই—হে রাম

হে রাম আমি দই বেচব না, রাধা শিকা থেকে দইয়ের মটকা নিয়ে গেছে। অর্ধপথে তার দেখা হবে কৃষ্ণের সঙ্গে। কৃষ্ণ তাকে কেশর ফুল ছুঁড়ে মারে। সুরদাস বলে গোয়ালিনীরা লুকিয়ে থাকে কৃষ্ণকে দেখবে বলে।

কী আনন্দ চারিদিকে। কিন্তু হায়! বর যে কানা। রাজার কাছে একথা গোপন রাখা হয়েছে কারণ রাজা জানতে পারলে নাপিত এবং পুরোহিত যারা বিয়ের যোগাযোগ করেছে তাদের দুজনেরই শাস্তি হবে। সমস্যার সমাধান করার জন্য ছোট রাজকুমারকেই 'মাড়োয়ায়' (ছাদনাতলায়) নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু ছোটরাজকুমারকে তো ফিরে যেতে হবে ভোর হওয়ার আগেই। তাঁর তো এখানে থাকা সম্ভব নয়। কনে বরকে ক্ষীর (পরমান্ন) দিল বাটি ভরে। ছোট রাজকুমার একটু খেয়ে বললেন, বাটিটা যেন প্রাসাদের সামনে শাল গাছের নীচে পুঁতে রাখা হয়। নববধুকে রাজকুমার কথা দিলেন ঠিক সময়ে নিয়ে যাবেন নিজের প্রাসাদে। বৌদিদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হল কিন্তু সকলেই চুপচাপ থাকলেন।

প্রতিদিনের মত তাঁর বৌদিরা সকালে তাঁর ঘুম ভাঙালেন। ছোট রাজকুমার যেন কিছুই জানেন না। প্রাতঃরাশ দিলেন বৌদিরা। বসে বসে গরম কচুরি খাচ্ছেন রাজকুমার এমন সময়ে এক বৌদি তাঁর কানে একটি ছোট্ট কাঠের কুচো ঢুকিয়ে দিলেন। অমনি রাজকুমার

একটি টিয়াপাখি হয়ে গেলেন। বেচারা রাজপুত্র উড়ে বনে পালিয়ে গেলেন। এখন বৌদিরা নিশ্চিন্ত। তাদের এই নৈশ বিহারের কথা তাদের স্বামীরা জানতে পারবে না। ওদের মধ্যে একজন বলল "ন রহেগা বাঁস ন বাজেগী বাঁসরি"—বাঁশই যদি না থাকে, তাহলে বাঁশিও বাজবে না। ভয়ের মূল যখন উপড়ে ফেলা হল তখন আর ভয় কী?

তিন ভাই ফিরে আসছেন অনেকদিন পরে বিদেশ ভ্রমণ সেরে। প্রাসাদের কাছাকাছি আসতেই একটি টিয়াপাখি এসে এক ভায়ের কাঁধে বসেছে। টিয়াপাখিটি কী সুন্দর। ভাইরা টিয়াটিকে নিয়ে এলেন ছোট ভাইকে উপহার দেওয়ার জন্য।

ছোটভাই কোথায় জিজ্ঞাসা করতে তাঁদের রানীরা বলল ও যদি সকালে বাড়িতে থাকে তাহলে রাত্রে থাকে না, আর যদি রাত্রে থাকে তাহলে সকালে থাকে না। ও কাউকে গ্রাহ্য করে না। রাজকুমাররা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ছোট রাজকুমার এমন তো ছিল না। এদিকে পাখিটি বড় রাজকুমারের হাত থেকে বেরোবার জন্য চেষ্টা করতে করতে তার কানের ভিতর থেকে কী যেন একটা পড়ে গেল।

অমনি সামনে দাঁড়ালেন এসে ছোট রাজকুমার। রানীদের মুখে কথা সরে না। রাজকুমাররা তখন সবই বুঝতে পারলেন। রানীদের তাঁরা চিরদিনের মত নির্বাসন দিলেন।

ছোট রাজকুমার দাদাদের কাছে নিজের বিয়ের কথা বললেন। তখন তাঁরা "বারাত" (বরের শোভাযাত্রা) সাজানোর ব্যবস্থা করলেন এবং ছোট ভায়ের বৌকে আনতে চললেন।

রাজার কাছে বিয়ের কথা বলাতে তিনি প্রমাণ চাইলেন। রাজপুত্র বললেন "বিয়ের রাত্রে যে সোনার বাটিতে আমাকে ক্ষীর

দেওয়া হয়েছিল সেই বাটিটি পোঁতা আছে শালগাছের তলায়। সত্যিই বাটিটি গাছের তলায় পাওয়া গেল আর রাজা ছোট রাজকুমারের মতো জামাতা পেয়ে খুবই প্রীত হলেন।

ওরা সবাই রাজ্যে ফিরে এলেন। ছোট রাজকুমার তাঁর রানীকে নিয়ে বহু বছর সুখে বাস করতে লাগলেন।

করুয়া চৌথের গল্প

কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীতে করুয়া চৌথের ব্রত পালন করে সধবা মেয়েরা। চাঁদ ওঠা পর্যন্ত মেয়েরা উপবাস করে এবং স্বামীর কল্যাণ কামনা করে।

এই ব্রতের একটি গল্প আছে।

প্রায় সন্ধ্যা তখন। সাত ভাইয়ের একটি বোন ভারী আদুরে চন্দা খিদে কাকে বলে কখনও জানত না। পিতামাতা ও ভাইরা যেমন করেই হোক ওকে সুখে রাখতে চেষ্টা করত। এই প্রথম বিয়ের পরে সে করুয়া চৌথ পালন করছিল। সারাদিন পাশা খেলে গল্প করে কাটিয়েছে কিন্তু দিনের শেষ প্রহরটি যেন আর কাটে না। বড় দুর্বল লাগছিল শরীর। ওর ছোট ভাই ওর কষ্ট সহ্য করতে পারছিল না তাই মাকে গিয়ে বলল 'মা জিজির (দিদি) খিদে পেয়েছে। ওকে কিছু খেতে দাও।' মা বললেন 'ও ব্রতপালন করছে, চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত ও খাবে না।'

ভাইটি চন্দার কাছে গিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগল যাতে ও খিদের কষ্ট ভুলে থাকে। কিন্তু তখনও চাঁদ উঠতে অনেক দেরী। দাদা মাকে

বলল 'মা চন্দাকে চাঁদ দেখাব ?' 'কী করে দেখাবে বাবা তুমি তো ভগবান নও।' মা বললেন।

দাদা গাছে একটা আলো ঝুলিয়ে দিল আর পাতা দিয়ে সেই আলোর খানিকটা ঢেকে দিল তারপর মাকে দেখাল 'দেখ মা চাঁদ।' মা গম্ভীর হয়ে বললেন 'এটা তো একটা ঠাট্টার ব্যাপার নয় এটা একটা ব্রত। চন্দাও শিশু নয় যে, সে একটু খিদে সহ্য করতে পারবে না। ও কাল স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছে আজ স্বামীর কল্যাণের জন্য যে ব্রত সেটা ওর মোটেই ভাঙা উচিত নয়।'

কিন্তু চন্দার দাদা ওর মার কথা শুনল না। সেই মেকী চাঁদ চন্দাকে দেখাল। চন্দাকে ওর দাদা টাটকা আর শুকনো ফল খেতে দিয়েছে। প্রথম গ্রাসেই চন্দা পেল একটা চুল। দ্বিতীয় গ্রাসে পেল একটা কাঁকর আর যেই তৃতীয় গ্রাস মুখে দিতে যাচ্ছে অমনি শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর এল ওর স্বামীকে সাপে কামড়েছে। গ্রাস আর মুখে উঠল না, চন্দার হাত মাঝপথেই থেমে গেল। বিনা মেঘে বজ্রপাত। মার সামনে গিয়ে দাঁড়াল চন্দা। লজ্জায় কাঁদতে পারছে না। পা কাঁপছে ঠকঠক করে। মাকে বলল 'মা আমি যাই ?' মার মুখে কথা সরে না 'যাও বাছা' কোনক্রমে মুখ থেকে এই কথা কটি বেরোল। মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন 'বাছা আমার, যাকে পাবি তারই আশীর্বাদ ভিক্ষা করবি। কে জানে কার তোর উপর দয়া হবে ? কে তোকে আশীর্বাদ করবেন ?

চন্দা সকলকেই প্রণাম করল কিন্তু কেউই চন্দাকে বলতে পারল না যে সে বিবাহিত জীবনে সুখী হবে। একটা বুড়ী ভিখারিনীকে নিজের গলার হার দিল। সে আশীর্বাদ করল 'তোমার ভাইরা ভাইপোরা

সুখে থাকুক মা।'

চন্দার স্বামীকে মনে পড়তে লাগল। শ্বশুরবাড়ির কথা মনে হতে লাগল। যখন নতুন বৌ হয়ে সে প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এল তখন সমস্ত বাড়িটাই যেন তাকে হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিয়েছে। সানাইয়ে এ বসন্ত রাগ বাজছিল সেদিন। ওর বড় জা ওকে বরণ করে নিয়ে গেল। বাড়ির ভিতরে। চন্দার তখন বাপের বাড়ির জন্য মন কেমন কেমন করছিল। বড় জাকে ও প্রণাম করল তখন ওর বড় জা ওকে আশীর্বাদ করে বললেন 'ভাবী সেলি সপুতি হো, বুঢ়ী সুহাগন হো, পেলি পতিয়ো রাজ করে, দুধো নাহাও পুঁতো ফলো। ভাই ভতীজে কে খেরে বসে।' (জা আমার, ঠাণ্ডা মেজাজ হোক তোমার, পুত্রবতী হও, স্বামী সোহাগিনী হও, পাকা চুলে সিঁদুর পর। ধনে জনে ভরে উঠুক তোমার সংসার। তোমার ভাই ভাইপোরা যেন গ্রাম ভর্ত্তি করে বসবাস করে।)

চন্দার মনে হল যেন যা কিছু পাওয়ার ছিল সব পেয়ে গেছে। কেউ ডাকল "সুনয়না! সুনয়না।" সুনয়না বলল মা 'ভাবী (বৌদি) এসেছে।' মা বললেন 'এই হতভাগীকে নিয়ে আমি কি করব? ওর সুখ সৌভাগ্য সবই খুইয়ে এসেছে।' এই বলে শাশুড়ী ঠাকরুণ বিলাপ করতে লাগলেন। কিন্তু চন্দাকে তার মৃত স্বামীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। বৈদ্য এসেছে, সাপের ওঝা এসেছে, কেউই কিছু করতে পারেনি। নাড়ী চলছে। হৃৎস্পন্দন থামে নি। প্রাণও রয়েছে, রয়েছে বেঁচে ওঠার আশা। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। কস্তুরী দিয়ে মালিশ করা হল। কোন লাভ হল না।

চন্দার ধারণা ছিল সর্পদষ্ট কোন লোকের দেহ একবছর রাখলে

সে বেঁচে উঠতে পারে। তাই সে সবাইকে মিনতি করল যেন তার স্বামীকে দাহ না করা হয়। এত যে দুর্ভাগা আর করুণার যোগ্য তার স্বামীর সর্পদষ্ট দেহ তাকে রাখতে দিল তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। শাশুড়ির চন্দার মুখ দেখতেও ইচ্ছা হত না তাই এক চামচ সরষের তেল আর একটু গুড় চন্দাকে পাঠিয়ে দিত। চন্দা তেল দিয়ে আলো জ্বালিয়ে রাখত আর গুড়ের টুকরোটা ঘরের এক কোণে ফেলে রাখত। স্বামীর মাথাটি নিজের কোলে নিয়ে সে দিনরাত বসে থাকত। একখানি কলাপাতায় স্বামীর বিছানা পেতে আরেকখানি গায়ে চাপা দিয়ে রাখত।

তার দেহ অত্যন্ত কৃশ হয়ে গেল কিন্তু মুখমণ্ডলে দেখা গেল এক অপার্থিব জ্যোতি।

ছাদ থেকে একদিন চন্দা দেখছে যে, মেয়েরা নদী থেকে স্নান সেরে ফিরছে। তারা খুব ভাল করে সাজগোজ করেছে 'সোলহ সিঙ্গারে'। একজন তাকে বলল গত বছর এমনি দিনেই তুমি স্বামীকে হারিয়েছিলে। "আমি কি আজ এই ব্রত পালন করব?" একজন একটু ভেংচি কেটে বলল "ইচ্ছা হলে কর।" একজন সন্ন্যাসিনী বলল "ব্রত কর মা। একেবারে নির্জলা উপবাস কর। যদি তুমি ব্রত পালন করতে পার হয়তো আজ তোমার স্বামীকে ফিরে পাবে। সোহাগের দেবী বৃদ্ধার ছদ্মবেশে সাতবার আসবেন। তোমার প্রতি এঁরা খুব রূঢ় ব্যবহার করবেন কিন্তু তুমি ওঁদের পায়ে ধরে মিনতি করবে। এঁরাই পারেন তোমার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিতে।" চন্দা আবার সন্ন্যাসিনীর পদধূলি নিল। বাড়ি ভাল করে ধোয়া মোছা করল। ধুনো জ্বেলে দিল ঘরে, ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিল ঘরে।

নববধূর মত সাজল চন্দা। সিঁথিতে সিঁদুর দিল, কপালে বিন্দি দিল (টিপ)। নতুন কাচের চুড়ি পরল। স্বামীর দেহটিকে স্নান করাল। কাপড় বদলে দিল। সেই রাত্রে এক বৃদ্ধা এলেন। তিনি বললেন—

"করুয়া লে, করুয়া লে
বীর পিয়ারী করুয়া লে
বাপ ভাই কী খট্টি খানী
করুয়া লে করুয়া লে
ধৌলী নাড়া ধৌলী সাড়ি
তেরা জনম যাইয়ো
করুয়া লে করুয়া লে
অধুরে চাঁদ খানি
করুয়া লে করুয়া লে।"

(করুয়া ব্রত পালন কর, বীরপ্রিয়া তুমি বাপ ভাই-এর উপার্জন ভোগ করছ। যতক্ষণ না চাঁদ উঠবে খেও না, যদি খাও তাহলে চিরকাল সাদা কাপড়ে বিধবার বেশে দিন কাটাতে হবে)। চন্দা তার পদধূলি নিয়ে আশীর্বাদ চাইল কিন্তু তিনি পা সরিয়ে নিলেন। বললেন "আমার বোন এসে তোমাকে আশীর্বাদ করবে।" এমনি করে ছ'জন বৃদ্ধা এলেন পরপর। তাঁরা একই কথা বললেন আর একই ভাবে চলে গেলেন। এইবার সপ্তম ভগিনী আসবেন। চন্দা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। এক-একটি মুহূর্ত যেন একটি যুগ। অবশেষে সেই দেবী এলেন। তিনি বললেন—

করুয়া লে, করুয়া লে
ভাইয়া পিয়ারী করুয়া লে

বাপ ভাই কী কমাই খানি
করুয়া লে করুঁয়া লে
ধোলা নাড়া ধোলী সাড়ি
অধুরে চাঁদ খানি
করুয়া লে করুয়া লে

(তুমি চাঁদ ওঠার আগে খেয়েছ তাই তুমি বিধবার বেশ পরেছ। তোমার ভাইয়েরা তোমাকে খুব আদর দেয়। এবার করুয়া ব্রত পালন কর।)

যেই দেবী সামনে এলেন চন্দা তাঁর কণ্ঠে মাল্যদান করল আর তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু তিনি চন্দাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ওর মাথাটা দরজায় ঠুকে গেল। রক্তে ভেসে গেল দেবীর পায়ের তলা তবু চন্দা পা ছাড়ল না। সে বলল "মা গো হয় ওকে বাঁচিয়ে দাও নাহয় আমাকে মৃত্যু দাও। আমি এমন করে আর বাঁচতে পারি না।"

দেবীর হৃদয় গলল। দেবী নিজের কনিষ্ঠা কেটে চন্দার স্বামীর দেহে সেই রক্ত ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে বসল। চন্দাকে জিজ্ঞাসা করল "তুমি কখন এলে ? আমার ঘুম ভাঙালে না কেন ?"

চন্দা লজ্জায় মুখ নীচু করে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল। চন্দার স্বামী তাকে সপ্রেম আলিঙ্গন করল। গতবার করুয়া চৌথে পাশা খেলায় চন্দা স্বামীকে হারিয়ে দিয়েছিল। আজ আবার সে চন্দাকে খেলতে ডাকল। চন্দার এখন খেলার শক্তি নেই কিন্তু অস্বীকার করতে তো পারে না। চন্দা যখন তার স্বামীর সঙ্গে পাশা খেলছে তখন সেই দাসী নিয়ে এল প্রতিদিনের বরাদ্দ সরষের তেল আর গুড়।

সে গিয়ে চন্দার শাশুড়িকে বলল যে চন্দা একজন অচেনা লোকের সঙ্গে পাশা খেলছে। শাশুড়ি বিশ্বাস করলেন না। নিজের চোখেই দেখতে এলেন। তারপর পুত্র প্রাণ ফিরে পেয়েছে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। চন্দা এবং তার স্বামী মায়ের পদধূলি নিল। মা পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করলেন "বুড়া সুহাগন হো, দুধো নাহাও পুতো ফলো।"

জগদ্দেব

"মহারাজ, ছোটরানীর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে।" জানাল পরিচারিকা। ধারার রাজা পরমার উদয়াদিত্য তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। এমন সময় প্রথম রানীর পরিচারিকা বলল "মহারাজ বড় রানীও একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছেন ছোটরানীর পুত্র জন্মাবার আগেই—আমি প্রথমে এসেছি কিন্তু মহারাজ ঘুম থেকে উঠবেন বলে অপেক্ষা কর ম।"

রাজা উদয়াদিত্য বললেন "ঠিক আছে কিন্তু ছোটরানীর পুত্রসন্তান লাভের খবর আমি আগে পেয়েছি—তাই ছোটরানীর পুত্রই আমার সিংহাসন লাভ করবে—বড় রানীর পুত্র নয়।"

বলাই বাহুল্য রাজা ছোটরানীকেই বেশী ভালবাসতেন। বড় রানীর ছেলের নাম হল জগদ্দেব আর ছোটরানীর ছেলের নাম হল রামধবল। রামধবল যথাকালে রাজা হলেন। জগদ্দেব খুব ধর্মভীরু ও উদার হলেন। তিনি দেবীর আরাধনা করলেন। দেবী তাঁকে শুধু দেখাই দিলেন না, তাঁর বিপদে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

জগদ্দেব ছোট ভাইকে খুবই ভালবাসতেন কিন্তু বিমাতা ছোটরানী ভাবলেন ভবিষ্যতে যদি জগদ্দেব তাঁর ছেলের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়—তাই তিনি জগদ্দেবকে ধারা রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বললেন। জগদ্দেব বিমাতার আদেশ শিরোধার্য করে ধারা রাজ্য ত্যাগ করলেন।

অনেকদিন পরে জগদ্দেব ও তাঁর রানী পাটনায় এসে পৌঁছলেন। এখানে এসে রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহের রাজসভায় সভাসদের মর্যাদা পেলেন। রাজসভায় নিজের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে জগদ্দেব রাজার এত সুনজরে পড়ে গেলেন যে তাঁর অনেক শত্রু হয়ে গেল।

রাজা বুঝতে পেরে জগদ্দেবকে বললেন "আপনার প্রতিদিন রাজসভায় আসার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে ডেকে পাঠালে তখন আসবেন। আমি যখন একা থাকব তখন আমার সঙ্গে দেখা করবেন।"

কিছুদিন পরে সিদ্ধরাজ রাজসভায় আসা ছেড়ে দিলেন। তিনি নতুন বিবাহ করেছেন। চারদিকে অনেক জনরব শোনা যাচ্ছিল। জগদ্দেব শুনলেন সিদ্ধরাজ অসুস্থ। সিদ্ধরাজের শয়নগৃহে জগদ্দেবের যাওয়ার আদেশ ছিল। তিনি রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন রাজার মুখটি অতি মলিন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "মহারাজ আপনার কী হয়েছে?" সিদ্ধরাজ বললেন "আমার প্রবল মানসিক অশান্তি চলছে, কিন্তু আমি যদি মুখে সব কথা বলি আমার মৃত্যু হবে; তাই যা-যা হয়েছে আমি লিখে দেব।"

তারপর সিদ্ধরাজ সব লিখলেন। যেদিন প্রথম নতুন রানী এলেন সেই রাত্রেই একজন ভীষণদর্শন লোক রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ

করল। রাজা তার সঙ্গে পেরে উঠলেন না। সে রাজাকে চিৎ করে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে খাটের তলায় রেখে নিজে খাটের উপর উঠে পড়ল। ভোর হতে সে রাজাকে খাটের তলা থেকে মুক্তি দিল এবং বলে গেল যদি রাজা কাউকে একথা বলেন তাহলে রাজা আর প্রাণে বাঁচবেন না। সে প্রতিদিন সিদ্ধদেবের শয়নগৃহে আসে। জগদ্দেব ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গিয়ে বললেন "মহারাজ, যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি আপনার শয়নগৃহে আজ উপস্থিত থাকব। রাজা বললেন, "না। আপনাকে এই বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে আমি বলতে পারি না।" "মহারাজ আমার নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আপনার কাছে আশ্রয় পেয়েছি। আপনার এত বড় বিপদে আমি তো চুপ করে থাকতে পারি না, আপনি আমাকে আপনার সেবা করার সুযোগ দিন।" রাজা তখন সম্মত হলেন। জগদ্দেবের রানী তাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন দেখে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। তিনি রানীকে রেখে রাত্রে রাজপ্রাসাদে চলে গেলেন।

জগদ্দেব কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে মস্ত বড় একখানি ছোরা নিয়ে রাজার শয়নকক্ষে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা এলেন মলিন বিমর্ষ মুখে। ঘরের এককোণে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। পিছন পিছন রানী ঢুকলেন কাঠের পুতুলের মত নিষ্প্রাণ। দাঁড়িয়ে রইলেন পালঙ্কের সামনে।

জগদ্দেব দেখলেন হিংস্র চেহারার একটা লোক জটপাকানো লম্বা চুল, লম্বা দাড়ি, পালঙ্কে এসে বসল। জগদ্দেব বিমূঢ়, রানী জ্ঞান হারালেন। শীঘ্রই জগদ্দেব নিজেকে সামলে নিয়ে লোকটার উপর ঝাঁপিযে পড়লেন। কিন্তু একটু পরেই তিনি বুঝলেন তাঁর

জীবন শেষ হয়ে আসছে। তিনি তখন দেবী ভবানীর দয়া প্রার্থনা করলেন আর তাঁর শরীরে আশাতীত এক শক্তির জোয়ার এসে গেল। জগদ্দেব ঐ লোকটির একটি পা ভেঙে দিলেন। তখন ও জগদ্দেবকে মুক্তি দিতে বলল এবং প্রতিজ্ঞা করল আর কখনই সিদ্ধরাজকে বিরক্ত করবে না। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল। রানী বাঘের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া হরিণীর মত কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে জগদ্দেবের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন। "রানী, আপনাকে আমি মায়ের মত দেখি—আপনি আমার পা ছুঁয়ে আমাকে অপরাধী করবেন না।" বললেন জগদ্দেব।

রাজা সিদ্ধরাজ জগদ্দেবকে আলিঙ্গন করে বললেন "বন্ধু, আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন। আপনি কী চান তাই বলুন, আপনাকে অদেয় কিছুই নেই।"

জগদ্দেব বললেন "আমাকে দেওয়ার আর কিছু নেই মহারাজ। আমার একটিই প্রার্থনা, রানী কোন অপরাধ করেন নি তাঁর ওপর আপনি যেন বিরূপ হবেন না।" সিদ্ধরাজ বললেন "আমি তাঁকে আপনার দেওয়া উপহার হিসাবে নিচ্ছি—চিরদিন মাথায় করে রাখব এই উপহার।"

রানী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। তাই শিবের এক ভৈরব সেই রূপের মোহে আত্মহারা হয়ে যায়। তার শাস্তি তাকে পেতে হল। ভৈরব গিয়ে দেবী ভবানীর কাছে আশ্রয় চাইল। তাঁর পায়ের উপর কেঁদে পড়ল। দেবী তাকে তিরস্কার করলেন বটে তবে জিজ্ঞাসা করলেন সে কী চায়। সে তখন দেবীকে বলল "যতদিন না জগদ্দেবের ছিন্নশির গোলকের মত নিয়ে খেলতে পারব ততদিন মনে শান্তি নেই আমার।"

দেবী ভবানী ভৈরবীর ছদ্মবেশে রাজা সিদ্ধরাজের রাজসভায় এলেন। তিনি রাজাকে আশীর্বাদ করলেন কিন্তু জগদ্দেবকে দেখে সামান্য একটু মাথা নোয়ালেন। রাজা বিরক্ত হলেন। রাজা ভৈরবীকে বললেন জগদ্দেবের কাছে কিছু চাইতে। রাজকীয় অহঙ্কারে মত্ত রাজা বললেন "জগদ্দেব যা দেবেন আমি তার শতগুণ দেব।"

ভৈরবীর হাতের ত্রিশূল ঝলসে উঠল। তিনি হেসে বললেন, "মহারাজ। উনি যা দেবেন তাই দিতে আপনি প্রস্তুত। আমি ওঁর কাছে চাইব শ্রেষ্ঠতম দান।"

ভৈরবী জগদ্দেবের সঙ্গে তাঁর বাড়ি গেলেন তাঁর জয়গান করতে করতে।

জগদ্দেব নম্রভাবে মাথা নীচু করে আছেন। তার রানী মাথা উঁচু করে রয়েছেন স্বামীগর্বে। জগদ্দেব বললেন "আমি আপনাকে কী দেব।" জগদ্দেবের রানী বললেন "যা কিছু চাইবার চান আপনি।"

ভৈরবী হাসলেন, তারপর খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন "আমি আপনার শির চাই।" তারপর জগদ্দেবের রানীকে বললেন "আপনি একটি থালিতে (থালায়) সেই শির আমাকে উপহার দেবেন।"

জগদ্দেব বললেন, "আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করব।" তিনি তাঁর কোষমুক্ত তলোয়ার দিয়ে নিজের শিরশ্ছেদ করলেন। রানী সেই শির একটি থালায় রেখে উপরে একটি জরিবোনা কাপড়ের আবরণ দিয়ে ভৈরবীর হাতে তুলে দিলেন। ভৈরবী সেই থালাটি নিয়ে রাজা সিদ্ধরাজের কাছে এলেন। রাজা জগদ্দেবের উপহার দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলেন। তাঁর রানীকে জিজ্ঞাসা করলেন এই দান তাঁরও করা উচিত কিনা। তাঁর রানী রাজি হলেন না। তিনি বললেন "এসব

শত্রুর ষড়যন্ত্র।" অন্য রানীরা বললেন "ভৈরবী রক্তপিপাসু। তার এই জিঘাংসাকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।" ভৈরবী তখন রাজা সিদ্ধরাজকে বললেন "রাজা ইতস্তত করবেন না। আমি আপনাকে প্রতিজ্ঞা পালনে বাধ্য করব না। এই থালির নীচে দিয়ে তিনবার চলে যান তাহলে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতির বন্ধন থেকে মুক্তি দেব। রানীরা রাজাকে জগদ্দেবের ছিন্নশির রাখা থালার তলা দিয়ে তিনবার নিয়ে গেলেন। তারপর ভৈরবী জগদ্দেবের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। জগদ্দেবের রানী নতমস্তকে বসেছিলেন। তিনি ভৈরবীকে তাঁর নিজের শিরও দিতে চাইলেন কিন্তু ভৈরবী জগদ্দেবের শির ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে পুনর্জীবিত করার জন্যই এসেছেন। রানী বললেন "না, আমার স্বামীকে আমি চিনি, তিনি তাঁর দান ফিরিয়ে নেবেন না।" ভৈরবীর মুখে করুণামাখা হাসি, জগদ্দেবের মুণ্ডহীন দেহের উপরকার আবরণ সরিয়ে ঠিক জায়গায় তাঁর শিরটি স্থাপন করে দেহের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রী বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে দেখলেন জগদ্দেব দাঁড়িয়ে আছেন। ভৈরবী দেবী দুর্গার সর্ববিধ মহিমায় আবির্ভূতা হলেন। তাঁর দশটি হাতে তিনি জগদ্দেবের মস্তক স্পর্শ করে তাকে আশীর্বাদ করে উচ্চারণ করলেন "জয় জগদ্দেব।" তারপর দেবী দুর্গা অন্তর্ধান করলেন।

শিশু রাজপুত্র ও তার বধূ

অপুত্রক রাজার মনে বড় কষ্ট। তারপর এক সাধুকে অনেক সেবা করে নিজের ভক্তির ফলশ্রুতি হিসাবে রাজা পেলেন একটি পুত্র সন্তান।

কিন্তু সাধু ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, রাজপুত্রের ছয় মাস বয়সেই বিবাহ দিতে হবে নচেৎ তার মৃত্যু হবে।

রাজার তো দুর্ভাবনার অন্ত নেই। রাজা মন্ত্রীকে ডাকলেন পরামর্শের জন্য। মন্ত্রী বললেন "মহারাজ আমার পুত্র আপনার পুত্রের হয়ে বিবাহেব যা-যা কৃত্য করে আসবে। এ কথা অবশ্যই গোপন রাখতে হবে।"

রাজা অন্য এক রাজার কাছে ব্রাহ্মণ ও নাপিত পাঠালেন তাঁর সুন্দরী কন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। এই ভাবে বিবাহ স্থির হল।

তারপর জমকালো বারাত নিয়ে রাজা চললেন রাজপুত্রের বিবাহ দিতে। পাঁচটি হাতি, শ'খানেক ঘোড়া চলল তাঁদের সঙ্গে। মন্ত্রীপুত্র বসেছে একটি সোনার অলঙ্কারে সাজান হাতিতে সেহ্‌রায় তার মুখ রয়েছে ঢাকা। চদ্দরের (চাদরের) নীচে ঢাকা রয়েছে ছ' মাসের ছোট্ট রাজকুমার।

খুব জাঁকজমক করে বিয়ে তো হল। এদিকে কনের সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়ার সময় মন্ত্রীপুত্র তার নিজের হাতের তলায় রাজপুত্রের ছোট্ট হাতখানি রেখে, তারই ছোট্ট আঙুলের ডগায় সিঁদুর নিয়ে রাজ-কুমারীর সিঁথিতে পরিয়ে দিল।

বিবাহ হয়ে গেছে, গভীর রাত্রে মন্ত্রীপুত্র একটি পানের রস দিয়ে রাজকুমারীর আঁচলে লিখে দিলেন যে, তিনি রাজপুত্র নন আর রাজকুমারীর আসল স্বামী ছোট্ট রাজপুত্র। রাজপুত্রকে রাজকন্যার বিছানায় শুইয়ে রেখে মন্ত্রীপুত্র পালিয়ে গেলেন। খুব ভোরে রাজকুমারীর ঘুম ভাঙল। তখন সমস্ত প্রাসাদ ঘুমে আচ্ছন্ন। রাজকন্যা

সব দেখলেন, সব জানলেন। তারপর নিজের অবোধ শিশু স্বামীকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন তাঁর পিতার রোষানল থেকে তাকে বাঁচাতে।

রাজকন্যা শাল, শিশু, কাঁঠাল মহুয়া গাছের গহন অরণ্যে চলেছেন। কখন কোন আমগাছের তলায় বিশ্রাম করে আম খাচ্ছেন, কখন কোন গাভীকে অনুনয় করছেন তাঁর ছোট্ট স্বামীর জন্য একটু দুধ দিতে। একটি কালো হরিণের দয়া হল, সে রাজকন্যা ও তার ছোট্ট স্বামীকে পিঠে করে অনেক দূর নিয়ে গেল। একটা নদী পার হওয়ার সময় প্রকাণ্ড এক রুই মাছ রাজকন্যাকে তার পিঠে নিয়ে পার করে দিল।

এমনি করে অনেকদিন চলে গেল। ছ' মাসের রাজপুত্র এখন একজন কিশোর বালক। রাজকুমারী বনের মধ্যে একখানি কুটির দেখলেন। রাজকুমারী রাত্রে সেখানে বিশ্রাম করবেন স্থির করলেন। এই কুটিরে একজন সাধু থাকতেন যিনি ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারতেন। সাধু রাজকন্যাকে তার স্বামীর রাজ্যের হদিস দিলেন। রাজকন্যা আরও অনেক নদী পেরিয়ে আরও অনেক গহন অরণ্যের মধ্যে দিন কাটিয়ে অবশেষে এলেন রাজপ্রাসাদে।

এক পরিচারিকাকে খবর দিতে বললেন রানীমাকে। রানীমা তাঁকে প্রাসাদে ডেকে নিলেন। সেই কিশোরকে দেখেই রানীমা চিনলেন নিজের পুত্র বলে কারণ সে যে পিতারই প্রতিবিম্ব। রানী আনন্দে চোখের জল ফেলে পুত্র ও পুত্রবধূকে নিবিড় আলিঙ্গন করলেন।

হারানো রাজপুত্রকে ফিরে পেয়ে প্রাসাদে সুখের শতদীপ জ্বলে উঠল।

কালো কাঠের পুতুলটি

রানীর বড় ভক্তি সাধুদের প্রতি। সাধু দর্শন করা, সাধুদের দানধ্যান করা তাঁর জীবনের ব্রত। একদিন রানীর কাছে এক সাধু এলেন। রানী তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করলেন। তার তুই কন্যার হাতে একটি করে থালি (থালা) ভরে মুক্তা ও মোহর দিয়ে বললেন "সাধুবাবাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দাও।" সাধুবাবাকে বললেন "বাবা আপনি ওদের আশীর্বাদ করুন।"

সাধু বললেন "ভগবান আপনার কন্যাদের মঙ্গল করুন; কিন্তু মা বড় তুঃখের কথা যে, বড় রাজকুমারীর স্বামী হবে একটি মৃতদেহ।

এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রানী এতই মর্মাহত হলেন যে, কন্যাকে নিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করলেন।

অনেক পথ অতিক্রম করে তাঁরা একটা বনের মধ্যে এলেন। বনের ভিতরে তাঁরা একটি অট্টালিকা দেখলেন। রানী তৃষ্ণার্ত। তিনি রাজকুমারীকে এই অট্টালিকা থেকে একটি বালতি ও দড়ি চাইতে পাঠালেন। সামনেই একটি কুঁয়া ছিল সেখান থেকে জল তুলে পান করবেন। রাজকুমারী যেই বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন অমনি দরজা সজোরে বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। রাজকুমারী চিৎকার করে মাকে ডাকতে লাগলেন। মা বললেন "বাড়ির কোন লোককে ডেকে দরজা খুলতে বল।" রাজকন্যা দেখলেন বিলাস ও আরামের উপকরণে পূর্ণ এই বাড়িতে একটিও লোক নেই। শেষকালে একটি মৃতদেহ দেখে তাঁর খুব ভয় হল। পালঙ্কের উপর শোয়ানো একটি যুবকের মৃতদেহ, তার সর্বাঙ্গে সুঁচ বেঁধান। রাজকন্যা রানীকে চিৎকার করে যা দেখেছেন

সব বললেন। রানী বললেন "এই যুবকই তোমার স্বামী। সাধুর গণনা মিলে গেছে। সাধু বলেছেন সমস্ত সূঁচ মৃতদেহের শরীর থেকে একটি একটি করে তুলে ফেলতে। তুমি তাই করো।" রাজকন্যা দিনরাত্রি সেই মৃত যুবকের শরীরের থেকে সূঁচ তুলে ফেলতে লাগলেন। এমনি করে বহু বছর কেটে গেল। রাজকন্যা একলা শূন্য পুরীতে বসে মৃতের শরীর থেকে সূঁচ তুলেই চলেছেন। হঠাৎ একদিন তিনি দেখলেন একটি দাসী বাড়ির বাইরে যাচ্ছে কুঁয়ার থেকে জল তুলতে। রাজকন্যা কেবল চোখের উপর বেঁধান সূচগুলি ছাড়া সবই তুলে ফেলেছেন এমন সময় সেই দাসী এসে দুচোখের থেকে সূঁচ তুলে ফেলতেই সেই যুবকের দেহে প্রাণসঞ্চার হল আর তিনি পালঙ্কে উঠে বসলেন। হাতের কাছে এক কৌটা সিঁদুর ছিল। তিনি দাসীর সিঁথিতে সেই সিঁদুর দিয়ে বললেন "আজ থেকে তুমি আমার রানী হলে। তুমি না থাকলে আমি জীবন ফিরে পেতাম না।" দাসী নিঃশব্দে সিঁদুর পরল আর রানীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হল। রাজকুমারী একটু জলপান করতে গিয়েছিলেন। এসে সব দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি রাজপুত্রকে কিছুই বললেন না। রাজপুত্রের দাসী হয়েই থাকলেন। রাজপুত্র জানতেও পারলেন না যে, রাজকন্যা কি কষ্ট করে নিজের জীবনের কতগুলো বছর নষ্ট করে রাজপুত্রের দেহ থেকে কাঁটা তুলেছেন।

একবার রাজপুত্র বিদেশে বেড়াতে বেরোলেন। তিনি যাওয়ার আগে রানীর জন্য কি আনবেন জিজ্ঞাসা করলেন। রানী চাইলেন সূঁচ আর সুতো। তারপর তিনি দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কী চায়। দাসী চাইল একটি কালো কাঠের পুতুল। রাজপুত্র ভাবলেন এটা

একটা সামান্য সুলভ উপহার। ফেরার আগে রাজপুত্র কিছু সূঁচ আর সুতো কিনলেন কিন্তু কালো কাঠের পুতুল কোনো দোকানে পাওয়া গেল না। দোকানে দোকানে ঘুরে রাজপুত্র এক বৃদ্ধার কাছে পেলেন একটি কালো কাঠের পুতুল। কিন্তু বৃদ্ধা দাম চাইল এক হাজার টাকা। রাজপুত্র ভাবলেন ভারী তো দাসীর পুতুল! এত দাম দিয়ে কিনতে হবে না।

তারপর নৌকায় করে দেশে ফিরে আসছেন হঠাৎ নৌকাডুবি হবার উপক্রম। তখন মাঝি বলল "যাত্রীদের মধ্যে কেউ একজন আছেন যিনি উপহার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অথচ উপহার সঙ্গে নেন নি তাঁরই জন্য নৌকাডুবি হতে চলেছে।" রাজপুত্র ফিরে গিয়ে সেই কালো কাঠের পুতুলটি কিনে আনলেন।

ফিরে এসে তিনি রানীকে সূঁচ সুতো দিলেন এবং দাসীকে কালো কাঠের পুতুলটি দিলেন। দুজনেই খুব খুশী।

দিনশেষে দাসী নিজের ঘরে গিয়ে কাঠের পুতুলটার সঙ্গে গল্প করতে লাগল। দাসী বলছিল "আমার কী দুর্ভাগ্য আমি কত বছর কাটিয়ে দিলাম রাজপুত্রের শরীর থেকে কাঁটা তুলে আর তিনি বিবাহ করলেন দাসীটাকে।" পুতুল বলল "রাজপুত্র নির্বোধ, তোমার প্রতি অবিচার করেছে। দাসীটা ওকে ঠকিয়েছে। দাসীটার শাস্তি হওয়া উচিত।" রাজপুত্র ঠিক সেই সময় নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সব শুনতে পেলেন।

পরদিন সকালে তিনি দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন "কাল রাত্রে কার সঙ্গে কথা বলছিলে?" রাজকন্যা নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে চাইলেন না। তিনি বললেন "না, না আমি কারুর সঙ্গেই কথা

বলছিলুম না।" কিন্তু রাজপুত্র তো এখন সবই জেনেছেন। তখন তিনি রানীকে, যে আসলে ছিল একজন দাসী তাকে বললেন "তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। তোমার পাল্লায় পড়েই এতবড় অন্যায় আমি করেছি—তুমি দূর হয়ে যাও আমার প্রাসাদ থেকে।"

এবার রাজকন্যার সিঁথিতে রাজপুত্র সিঁদুর দিয়ে দিলেন। তারপর তারা চিরদিন সুখে জীবন কাটাতে লাগলেন।

বিজয়মল

বিহারের শাহাবাদ জেলায় রোহতাসগড়ে একটা পুরানো কেল্লা আছে পাহাড়ের উপর। সেই কেল্লাটিকে ঘিরে নানারকমের গল্প লোক মুখে প্রচলিত।

রোহতাসগড়ের রাজা ধূরমলের দুই পুত্র ধীরানন ও বিজয়মল। ধীরাননের রানীর নাম ছিল সোনামতী। বিজয়মল দেবী দুর্গার কৃপায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধীরাননের থেকে বিজয়মল তাই ছিলেন বয়সে অনেক ছোট।

বাওনসুবার রাজার ছেলে একটি, নাম মানিকচাঁদ। মেয়ে একটি, নাম তিলকী। বাওনসুবার রাজা একজন ব্রাহ্মণ ও একজন নাপিতকে তিলকীর বিবাহের সম্বন্ধ করতে পাঠালেন। কোথাও সম্বন্ধ না ঠিক করতে পেরে শেষকালে এঁরা রোহতাসগড়ে এলেন। বিজয়মলের সঙ্গে তিলকীর বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা রাজা ধুরমলের ছিল না কারণ বাওনসুবার রাজার পররাজ্য আক্রমণ ও নিষ্ঠুরতার জন্য বদনাম ছিল। কিন্তু ধুরমলের জ্যেষ্ঠপুত্র ধীরানন তাঁকে এই বিবাহ-

প্রস্তাব গ্রহণে রাজি করালেন।

বাওনসুবার রাজা খুব ধূমধাম করে তিলক পাঠালেন। বাওনসুবা থেকে একলাখ লোক এল তিলক নিয়ে। ধীরানন তাদের মাখবার জন্য দিলেন সুগন্ধি তেল আব পান করবার জন্য ঘি। তিলকীর ভাই মানিকচাঁদ এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

রাজা ধুরমল ও তাঁর পুত্র ধীরানন বর নিয়ে আর বারাতে ছাপান্ন লক্ষ লোক নিয়ে বাওনসুবায় এলেন। বাওনসুবার রাজা খুব ধূমধাম করে তিলকীর বিবাহ দিলেন, বরযাত্রীদের আদরযত্ন করলেন। কিন্তু মানিকচাঁদের মনে বিষ। সে সব বরযাত্রীদের মাড়োয়ায় নিয়ে গেল আদব করে। ধুরমল সিংহ খুব আগ্রহভরে মাড়োয়ায় এসে ধীরানন এবং অন্যান্য বরযাত্রীসহ মানিকচাঁদের হাতে বন্দী হলেন। একমাত্র বিজয়মল মুক্ত রইলেন। সকলকেই মানিকচাঁদ বাওনসুবার বন্দীশালায় ঢুকিয়ে দিলেন। পক্ষীরাজ ঘোড়া হিনছল বছেড়া দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ আর পা ছিল বাঁধা। মানিকচাঁদ তিলকীর সখী চালহাকী নাউনকে বিজয়মলকে আগুনে নিক্ষেপ করবার হুকুম দিল। চালহাকী নাউন সে হুকুম তামিল করল না। সে হিনছল বছেড়াকে মুক্ত করে দিয়ে বিজয়মলকে তার পিঠে চড়িয়ে ঘোড়াটাকে বলে দিল রোহতাসাগড়ে উড়ে যেতে। হিনছল বছেড়া রোহুতাসগড়ে গিয়ে সোনামতীকে সব কথা জানাল। সোনামতী সব শুনে দুঃখে আকুল হয়ে উঠলেন।

বিজয়মলের যখন বারো বছর বয়স তখন একদিন প্রতিবেশী বালকদের সঙ্গে গুল্লী ডাণ্ডা খেলছিল। একটি কানা ছেলে তাকে বলল "তোমার নিজের গুল্লী ডাণ্ডা আন না কেন?" সোনামতী তাকে

সাধারণ একজোড়া গুল্লীডাণ্ডা কিনে দিলেন। সেইটি নিয়ে খেলতে গেলে কানা ছেলেটি বলল "এ কোনো রাজপুত্রের উপযুক্ত নয়। তোমার গুল্লীডাণ্ডা হবে লোহার, প্রত্যেকটার ওজন হবে আশি মণ করে।" বিজয়মল ভীষণ রেগে গিয়ে সোনামতীকে বলল সব কথা। সোনামতী তখনই কামার ডেকে এক জোড়া গুল্লীডাণ্ডা তৈরী করতে বললেন। সেই গুল্লীডাণ্ডা কেউই নাড়তে পারল না। বিজয়মল একহাতে ডাণ্ডাটা অবহেলায় ধরে সুন্দরভাবে গুল্লীতে আঘাত করল। সেই গুল্লী গিয়ে পড়ল বাওনসুবায়। সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। কানা ছেলেটি বলল "বন্ধু তোমার শরীরে এত বল তবু তুমি তোমার বাবাকে-দাদাকে কারামুক্ত করছ না।" বিজয়মল খেলাধূলা করে ফিরে এসে সোনামতীকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। সোনামতী তখন বিজয়মলকে সব কথা বললেন। বিজয়মল প্রতিজ্ঞা করল যে, তখনই নিজের বাবা ও দাদাকে কারামুক্ত করবে। সোনামতী বাধা দিলেও শুনল না। হিনছল বছেড়ায় চড়ে ছুটল বাওনসুবার দিকে। অনেক বন পেরিয়ে অনেক পাহাড়ে উঠে অনেক নদী সাঁতরে বিজয়মল বাওনসুবায় পৌঁছল। ভাওরানান পুকুরের সামনে সে এসে থামল। তিলকীর ষোলটি সখী সেখানে জল নিতে গিয়েছিল তখন। একটি তীর মেরে বিজয়মল ষোলটি কলসি ফাটিয়ে দিল। সখীরা গিয়ে তিলকীকে এই খবর দিল। তখন তিলকী তার অভিন্নহৃদয় সখী চালহাকী নাউনকে বলল "যা দেখে আয় এত হাতের টিপ কার, কে সে?" বিজয়মল চালহাকীকে দেখে যোগীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করল। চালহাকী বিজয়মলকে বলল "তুমি এখনই এ দেশ ছেড়ে চলে যাও, না হলে রাজা তোমাকে বধ করবেন।" বিজয়মল বলল "বাওনসুবার

রাজা আমার শ্বশুর।” তারপর সমস্ত ঘটনা চালহাকীকে বলল। তিলকীও বিজয়মলের আসার খবর পেয়ে গেছে। তিলকী সাজগোজ করে স্নানের ছুতো করে মাব অনুমতি নিয়ে ভাওরানান পুকুরে চলে এল। তিলকীর সুন্দর মুখ দেখে বিজয়মল মূর্ছিত হলেন। হিনছল বছেড়া তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। তিলকী সরমে রাঙা হয়ে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকল। সে বলল “তুমি আমাকে নিয়ে চল। আমরা পালিয়ে যাই। নইলে তোমার যদি কোনো ক্ষতি হয়।” কিন্তু বিজয়মল শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালাতে রাজি হল না। তার সঙ্কল্প নিজের দাদা ও বাবাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা।

হিনছল বছেড়ার পিঠে চড়ে বিজয়মল নগরে প্রবেশ করল। একটা কুঁয়ার ধারে সে থামল। রাজার একজন দাসী জল তুলছিল। বিজয়মলকে সে জল দিতে অস্বীকার করল। বিজয়মল একটা তীর মেরে তার কলসি ভেঙে দিল। রাজার কানে একথা যাওয়া মাত্র রাজা জসরামকে পাঠালেন বিজয়মলকে দমন করতে। জসরাম ছিল বাওন-সুবার সবচেয়ে শক্তিশালী কুস্তীগির। বিজয়মল তাকে একেবারে শুইয়ে দিলেন। তারপর তিনশ ডোম এল বিজয়মলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কিন্তু ডোমেরাও পরাস্ত হল বিজয়মলের হাতে। রাজা তখন অগত্যা পাঠালেন সৈন্য। বিজয়মল দেবী দুর্গার শরণাপন্ন হলেন। হিনছল বছেড়া রাজার সৈন্যদের পদদলিত করে তছনছ করে দিল। কিন্তু তাকে কেউ ধরতে পারল না। সৈন্যরা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পিছিয়ে গেল।

বিজয়মল এবার দুর্গে এসে বাবা ও দাদাকে তিলকীর সাহায্যে মুক্ত করলেন। কিন্তু মানিকচাঁদ বিজয়মলকে হত্যা করল। হিনছল বছেড়া বিজয়মলের ক্ষতবিক্ষত রক্তে ভেজা দেহ নিয়ে দেবী দুর্গার কাছে গেল।

দেবী তাঁর কনিষ্ঠা কেটে একবিন্দু রক্ত দিলেন বিজয়মলের মুখে। বিজয়মল জীবন ফিরে পেলেন। তিনি বাণ্ডনস্থবার রাজা এবং রাজপুত্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে রোহতাসগড়ের দুর্গে আজীবন বন্দী করে রাখলেন।

রোহতাসগড়ে সোনামতীর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি স্বামীকে, শ্বশুরকে, দেওরকে ফিরে তো পেলেনই আর পেলেন তিলকীর মত অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা জা।

ইন্দলের বিবাহ

মহোবার রাজা পরমলের দু'জন সামন্ত ছিলেন অল্হা এবং উদল। এরা দু'জন দুইভাই ছিলেন। দু'জনেই দু'জনের জন্য সর্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। দুই বীর অনেক লড়াই জিতেছিলেন। বিহারের চারণকবির গানে গাথায় দু'জনেই আজও অমর হয়ে আছেন।

অল্হার পুত্র ছিলেন ইন্দল। দশহরার দিন গঙ্গাস্নান অতি পুণ্যের। উদলের ইচ্ছা হল বিঠুরে গিয়ে দশহরায় গঙ্গাস্নান করবেন। ইন্দল জেদ ধরল সে কাকার সঙ্গে বিঠুরে যাবে। অল্হা পুত্রকে বাধা দিলে উদল দাদাকে বুঝিয়ে রাজি করালেন। অল্হার মামা মাহিল আর অন্য একজন সামন্ত ধেবা ওঁদের সঙ্গে গেলেন।

বলখের রাজা অভিনন্দনের কন্যা চিত্ররেখাও এসেছিলেন বিঠুরে স্নান করতে। স্নানের সময় ইন্দলকে দেখে রূপমুগ্ধ হয়ে চিত্ররেখা তাকে বিবাহ করবে স্থির করল। ওর যাদুকরী সখী কেসরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল চিত্ররেখা। উদলের নৌকার সমস্ত যাত্রীকে যাদুবলে

ঘুম পাড়িয়ে দিল কেসর। তারপর ইন্দলকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে টিয়াপাখি বানিয়ে রাখল।

এদিকে সেই গভীর যাদুনিদ্রা ভেঙে গেলে উদল দেখলেন ইন্দল উধাও। ভয়ে উদলের প্রাণ উড়ে গেল। দাদাকে তিনি কী বলবেন। কিন্তু মাহিল বললেন "নিশ্চয় এ কোনো যাদুকরের কীর্তি।" উদল ফিরে এসে বললেন "ইন্দল হারিয়ে গেছে।" অল্‌হা ক্রোধে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উদলকে প্রহার করতে লাগলেন। প্রহার করে যখন ক্লান্ত হয়ে গেলেন তখন জল্লাদকে ডেকে বললেন ওকে গহন বনের ভিতর নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে। হত্যা করার পর জল্লাদ যেন উদলের হৃৎপিণ্ড আর চোখ দুটি নিয়ে এসে তাঁকে দেখায়।

অল্‌হার স্ত্রী সোনোবা হায় হায় করতে লাগলেন। অনেক চেষ্টা করলেন স্বামীর উদ্দাম বর্বর ক্রোধ শান্ত করার। তারপর বললেন "আপনার এই কাজের জন্য আপনাকে চিরজীবন অনুশোচনা করতে হবে।" কিন্তু অল্‌হা তার সঙ্কল্পে অটল রইলেন। সোনোবা তখন গোপনে জল্লাদকে কিছু অর্থ দিয়ে বশ করলেন আর তাকে বুদ্ধি দিলেন অল্‌হাকে হরিণের চোখ এবং হৃৎপিণ্ড এনে দেখাতে। উদলকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসতে বললেন।

উদলের স্ত্রীও কিছু মোহর দিয়ে জল্লাদকে অনুনয় করলেন যেন তাঁর স্বামীকে সে হত্যা না করে।

রাজা পরমল এইসব জানতে পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। মাহোবা রাজ্যশুদ্ধ লোক অল্‌হার এই বিচারের কথা শুনে হায় হায় করতে লাগল।

এদিকে সোনোবা ধেবাকে পাঠালেন উদলকে রক্ষা করার জন্য।

ধেবা উদলের সঙ্গে দেখা করে উদলের শ্বশুরের রাজ্য নরবরগড়ের দিকে রওনা হলেন। শ্বশুরবাড়িতে উদলের শাশুড়ি উদলকে খুব যত্ন করতে লাগলেন আর শ্যালক মকরন্দির সঙ্গে হেসেখেলে বেশ সুখেই উদলের দিন কেটে যেতে লাগল। উদল, ধেবা এবং মকরন্দি যোগীর বেশ ধরে ইন্দলকে খুঁজতে বেরোলেন। তাঁরা বহু দেশে নাচগান করে বেড়িয়ে শেষে বলখ্ নগরীতে পৌছলেন। তাঁরা নাচগান করে নগরীর সমস্ত লোককে মাতিয়ে দিলেন। রানী তাঁদের নাচগানে মুগ্ধ হয়ে চিত্ররেখাকে ডাকলেন দেখবার জন্য।

রাজকুমারী যোগীদের বিশেষ সমাদর করার জন্য তাঁর মহলে নিয়ে গেলেন। রানী তাঁর সম্মতি দিয়েছিলেন। চিত্ররেখা ইন্দলকে নিজের মহলে নিয়ে যাদুবলে তাকে আবার টিয়াপাখি থেকে মানুষে পরিণত করলেন। ইন্দলকে চিত্ররেখা বললেন "রূপের বড় গর্ব আপনার। এবার দেখুন যোগীরা কত সুপুরুষ।" ইন্দল তীক্ষ্ণ চোখে যোগীর দিকে তাকিয়ে বললেন "রাজকুমারী বিভ্রান্ত হয়ো না। উনি যোগী নন, উনি আমার পিতৃব্য উদল।"

চিত্ররেখা এ-কথা শুনে চমকে উঠলেন। উদল চিত্ররেখাকে বললেন "রাজকুমারী আমি ইন্দলকে সঙ্গে নিয়ে যাব। যখন থেকে ইন্দল নির্খোজ হয়েছে তখন থেকে ওর পিতা পাগলের মত হয়ে গেছেন।"

চিত্ররেখা উত্তর দিলেন "না ওঁর সঙ্গে আমার বিবাহ না হওয়া অবধি ওঁকে যেতে দেব না। অনেক কষ্ট করে ওঁকে পেয়েছি।" তখন উদল শপথ করলেন যে ইন্দলের সঙ্গে চিত্ররেখার বিবাহ দেবেন।

উদল তখন ইন্দলকে নিয়ে সিরসায় গেলেন। সেখানে মালখের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। উদল মালখেকে বললেন "ভাই মালখে তুমি ইন্দলকে দাদার কাছে নিয়ে যাও কিন্তু আমি কোথায় আছি বোলো না। তাঁকে বোলো যেন ইন্দলের সঙ্গে বলখ নগরীর রাজকন্যা চিত্র-রেখার বিবাহ দেন।" তারপর তিনি মকরন্দির সঙ্গে নরবরগড় চলে গেলেন। সেখান থেকে তিনি দুখানি পত্র লিখলেন তাঁর স্ত্রী ফুলোবাকে আর অল্‌হার স্ত্রী সোনোবাকে।

মালখে অলহার কাছে ইন্দলকে নিয়ে এসে সব কথা বললেন। চিত্ররেখার সঙ্গে ইন্দলের বিবাহ দিতেই হবে জেনে অল্‌হা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন। মালখে তাঁকে নিরস্ত করলেন কিন্তু তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

সোনোবা স্বামীকে বললেন "আপনি যেভাবে উদলের উপর প্রতিশোধ নিয়েছেন সেইভাবে রাজা অভিনন্দনকেও পরাজিত করেন যদি তবে বুঝব আপনি শক্তিমান।" সোনোবা প্রতিজ্ঞা করলেন রাজা অভিনন্দনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর কন্যা চিত্ররেখাকে ছিনিয়ে এনে ইন্দলের বিবাহ হবে। যদি অল্‌হা এ কাজে উদ্যোগী না হন তাহলে তিনি নিজেই যুদ্ধ করবেন।

নির্দিষ্ট দিনে বারাত বেরোল। মকরন্দি মাহোবায় ছিলেন না তাই বারাত চলল নরবরগড়। মকরন্দি নিজের সৈন্য নিয়ে বারাতে যোগ দিলেন। উদল গোপনে একটি তাঞ্জামে বসে বারাতের সঙ্গে চললেন।

বলখ নগরীর তিন মাইলের মধ্যে যখন বারাত পৌঁছবে তখন উভয়-পক্ষের সৈন্য পরস্পরকে আক্রমণ করল। বলখ নগরীর সাত রাজপুত্র অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করল। অল্‌হা ও মালখের সৈন্যরা হেরে গেল। মালখে মকরন্দিকে গোপনে খবর পাঠালেন। উদল এই পরাজয়ের

খবর পেয়ে একচোট হেসে নিলেন তারপর নিজের সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধে নামলেন। তিনি সাতজন রাজপুত্রকেই বন্দী করলেন।

যখন অল্‌হা দেখলেন এই বীরযোদ্ধা আর কেউ নয় ওঁরই ভাই উদল, তখন তিনি চোখের জলে ভেসে অনুজের কাছে ক্ষমা চাইলেন। উদল দাদার পাদস্পর্শ করলেন। রাজা অভিনন্দন পরাজিত ও বন্দী হলেন।

সকলে তখন দুর্গের দিকে চলেছেন, ইন্দল একা একটি পালকীতে চড়ে। তারপর ইন্দলের সঙ্গে হল চিত্ররেখার বিবাহ। এত ধুমধাম করে বিবাহ হল মনে রাখার মত। মাহোবাতে সবাই ফিরে এলে রাজবাড়ি আনন্দে ঝলমল করে উঠল।

সোরথী

সোরথপুরের রাজা ছিলেন নিঃসন্তান। একটি সন্তানলাভের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। তাঁর কুল পুরোহিত ব্যাসমুনি তাকে বললেন গভীর বনে গিয়ে তপস্যা করতে। তিনি বনে গিয়ে বহুদিন ধরে তপোমগ্ন রইলেন। তারপর দৈববাণী হল যে, তিনি একটি কন্যাসন্তান লাভ করবেন। তিনি আনন্দিত মনে ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে।

তাঁর রানী তারার গর্ভে একটি কন্যার জন্ম হল। ব্যাসমুনি মেয়েটির নাম রাখলেন সোরথী। জন্মের মুহূর্তে সোরথী নিজেই ঘোষণা করল যে, সে ইন্দ্রের অভিশাপে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মর্তে জন্ম নিয়েছে।

ব্যাসমুনি বুঝতে পারলেন কন্যাটি সম্পূর্ণ সুলক্ষণা আর সে তার

বারটি পূর্বজন্মের কথা বলতে পারে। ঈর্ষায় কুলপুরোহিত জ্বলতে লাগলেন। এই কন্যা বড় হয়ে উঠলে তাঁকে আর কেউ মানবে না এই ভয় হল ব্যাসমুনির। তাই তিনি একদিন রাজাকে বললেন "মহারাজ আপনার এই কন্যাটি অতি সুলক্ষণা, সর্বগুণসম্পন্না কিন্তু ওর কুলগ্নে জন্ম। তাই ওরই জন্য সোরথপুর ধ্বংস হয়ে যাবে এবং রাজবংশের নাম মুছে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে।" "রাজা জিজ্ঞাসা করলেন এই বিপদের কি কোন প্রতিকার নেই?" ব্যাসমুনি বললেন "আছে বৈকি, কিন্তু সে বড় কঠিন কাজ। এই কন্যাকে একটি কাঠের বাক্সে ভরে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে।"

রাজা ও রানী একদম মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু রাজ্য বাঁচাবার জন্য পুরোহিতের কথামতো কাজ করলেন। সোরথীর ছোঁয়া পেতেই বাক্সটি সোনায় পরিণত হল। বাক্সটি ভেসে চলল।

একজন ধোপা কাপড় কাচছিল বাক্সটি সেখানে এসে থামল। সে লোভের বশে বাক্সটি ধরতে চাইল কিন্তু বাক্সটি তার নাগালের বাইরে সরে যেতে লাগল। তখন প্রতিবেশীরা তাকে বলল কুমোর কেকাকে দিয়ে বাক্সটা ধরাতে। কেকা ছিল ধার্মিক, সে তখনই বাক্সটি ধরে ফেলল। বাক্সটি খুলে সে শিশু সোরথীকে পেল। তার সন্তান ছিল না। সে খুশি মনে শিশু কন্যাটিকে নিয়ে সোনার বাক্সটা লোভী ধোপাকে দিল। ধোপা ছুঁতে ছুঁতেই সোনার বাক্সটি আবার কাঠের বাক্সে পরিণত হল।

কেকা আর তার স্ত্রী সস্নেহে শিশুটিকে পালন করতে লাগল। একদিন সোরথী তার পিতাকে বলল "তুমি কত খাট অথচ কত কম উপার্জন কর"—এই বলে সে মাটির জিনিস পোড়াবার উনুনটা ছুঁয়ে

দিল আর সব মাটির পাত্র সোনা হয়ে গেল। কেকা কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু তার খরিদ্দাররা বেশী দাম দিয়ে মাটির জিনিসগুলি কিনতে লাগল। তবে কেকা বুঝতে পারল কি ঘটেছে। তাই বেশ ভেবেচিন্তে জিনিস বিক্রী করতে লাগল চড়া দামে।

দেবরাজ ইন্দ্রের ইচ্ছা পূর্ণ করে ভগবান বিশ্বকর্মা সোরথীর নামে রাতারাতি এক সোনার মন্দির বানিয়ে দিলেন।

সোরথপুরের রাজ্যময় এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ল আর রাজ পুরোহিত মন্দিরটি দেখলেন। মনের জ্বালায় তিনি সোরথীর সর্বনাশ চিন্তা করতে লাগলেন। এখন সোরথী সুন্দরী যুবতী। রাজা উদয়ভানকে ব্যাসমুনি বললেন "কুমোর কেকার একটি সুন্দরী কন্যা আছে। মহারাজ এই কন্যাটিকে বিবাহ করুন।" রাজা কেকার কন্যাকে বিবাহ করাই স্থির করলেন। দরিদ্র কেকা ভয়ে বৃদ্ধ রাজার হাতে কন্যাদান করতে সম্মত হল।

বিবাহের সময় যেই রাজা সোরথীর সীমন্তে সিঁদুর দিতে গেলেন অমনি সোরথী বলে উঠল "কী দুর্ভাগ্য আমার! কে কবে শুনেছে পিতা তার কন্যাকে বিবাহ করতে চায়?" আত্মীয় অতিথি সকলেই একথা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠল। ব্যাসমুনি তাদের কৌতূহলকে চাপা দিয়ে দিলেন। রাজার কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্ত হল না। রাজা সোরথীর কাছে তার কথার অর্থ জানতে চাইলেন। সোরথী তখন বহু বছর আগে যা যা ঘটেছিল সবই বলে দিল।

রাজা তখন কন্যার কাছে ক্ষমা চাইলেন আর তাকে প্রাসাদে ফিরিয়ে আনলেন। কেকাকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করলেন। আর ব্যাসপণ্ডিতকে চিরকালের মত নির্বাসন দিলেন।

সুখিয়া ও দুখিয়া

বিহারের এক গ্রামে অনেককাল আগে দুই বোন ছিল। একজন ছিল খুব সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী তার নাম সুখিয়া, অন্য বোনটি ছিল কুৎসিত ও বোকা তার নাম দুখিয়া।

একদিন শীতের দুপুরে উঠানে রোদে বসে যাঁতায় গম ভাঙছিল সুখিয়া। সেখান দিয়ে একজন ধনী পথিক তাকে দেখতে পেলেন। তিনি নাপিত ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত পাঠালেন সুখিয়ার বাবার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে।

সুখিয়ার বাবা তার মেয়ের ধনী লোকের সঙ্গে বিবাহে খুবই আনন্দিত হলেন।

কিন্তু দুখিয়ার বিবাহ হল গরীব কৃষকের সঙ্গে। দুখিয়া বেচারী কোনদিনই সচ্ছলতার মুখ দেখল না।

ওদের একটি দাদাও ছিল। বাবার মৃত্যুর পর দাদাই হলেন পরিবারের কর্তা। দাদার একটি পুত্র হল। বৌদি দুখিয়াকে পাত্তাও দিতেন না গরীব বলে। কিন্তু ছেলের ছঠিহার পূজার দিনে অন্য সব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দুখিয়ারও নিমন্ত্রণ হল পিত্রালয়ে। ছঠিহার পূজা সন্তানের জন্মের ষষ্ঠ দিনে করা হয়। ষষ্ঠী মাতা যাঁর আশীর্বাদে সন্তান লাভ হয় যিনি শিশু সন্তানদের কল্যাণ করেন তাঁর পূজা করা হয় এবং আত্মীয় বান্ধব সকলকে ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

সুখিয়া এল পিত্রালয়ে নিজস্ব টোঙ্গায় চড়ে। গা-ভরা গহনা। পরনে রেশমী শাড়ি। ভাইপোর জন্য এনেছে রেশমী ধুতি ও চাদর একদম শিশুর নিজের মাপে। ওর বাহুর মাপে অনন্ত ও তাবিজ, কানে

কুণ্ডল গলায় মোহন মালা।

বৌদি তো আদর যত্নের কোন সীমা রাখল না। সুখিয়াকে কত যত্ন করে খাওয়াল, কত মিষ্টি কথা বলল আবার আসার জন্য কত অনুরোধ করল।

গরীব দুখিয়া হলুদ বাটা দিয়ে ছোপান শাড়ি পরে এল। বেচারী দুখিয়া একমুঠো দুর্বাঘাস আর ধান ছাড়া কিছু আনতে পারেনি ভাইপোকে আশীর্বাদ করার জন্য।

বৌদি তাকে খুবই অবহেলা করল। যাবার সময় একমুঠো কোদো এবং একমুঠো দুর্বা তার আঁচলের খুঁটে বেঁধে দিল বৌদি।

দুঃখিনী বোন দুখিয়া কিছুই বলল না। চলে গেল। হেঁটে সে বাড়ি ফিরবে।

যেই গ্রামের রাস্তা পার হবে দুখিয়া এমন সময় তার আঁচলের খুঁট থেকে ঝরে পড়তে লাগল রাশি রাশি মুক্তা।

ছাদে দাঁড়িয়ে বৌদি এই দৃশ্য দেখতে পেল।

তখনই সে স্বামীর কাছে ছুটে গিয়ে বলল "যান, যান, ছুটে যান দুখিয়াকে ফিরিয়ে আনুন। দুখিয়া যেন রাগ করে না চলে যায়।"

দাদা গরীব বোনকে তেমন যত্ন করত না কিন্তু স্ত্রীর কথায় দুখিয়াকে ফিরিয়ে আনল তারপর তাকে কিছু মোহর উপহার দিল, আর দিল একখানা ঢোঙা।

দুখিয়া তখন আনন্দিত মনে ভাই-এর দেওয়া ঢোঙায় চড়ে বাড়ি ফিরে গেল।

একটি পারুল বোন

রাজার একটিমাত্র মেয়ে। সাত ভাই-এর একটিমাত্র বোন। ভাইদের চোখের মণি বোন। ভাইদের বিয়ে হল। সাত বৌ এল বাড়িতে। সবাই ভালবাসে রাজকন্যাকে। শুধু ছোট বৌরানী তাকে হিংসা করত।

রাজকন্যারও বিয়ে হল। রাজা কিন্তু গৌনা করতে দিলেন না। এক বছর মেয়েকে নিজের কাছে রাখবেন ঠিক করলেন। ভাইরা ভাজরা তাকে আদরে ডুবিয়ে রাখত। আহা একবছরই তো আর থাকবে, তারপর তো শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। কিন্তু ছোট বৌরানীর কোনো বদল হল না। রাজকন্যা আরও একবছর থাকবে জেনে তার খুব রাগ হল।

বর্ষাকালে বিহারে "তীজ" উৎসব হয়। মেয়েরা নদীতে স্নান করে নতুন শাড়ি পরে। তারপর খুব ভাল করে সাজে, গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোলে, গান করে।

এ বছর 'তীজে'র দিনও রাজকন্যা ও রাজবধূরা যাচ্ছে নতুন শাড়ি নিয়ে নদীতে স্নান করতে। রাজকন্যার নিজের কোন নতুন শাড়িই পছন্দ হল না, তার পছন্দ হল ছোট বউ রানীর একখানি-নতুন শাড়ি। ছোট বউরানী বলল "তোমাকে আমার শাড়ি পরতে দেব বটে তবে যদি শাড়ি ছেঁড়ে বা ময়লা হয়ে যায় তাহলে আমি সেই শাড়ি তোমার রক্তে রাঙিয়ে পরব।" রাজকন্যার শাড়িখানি এতই পছন্দ হল যে, সে এই শর্তেই শাড়িখানি পরতে রাজি হল। খুব যত্ন করে সখীদের সবার শাড়ির তলায় ছোট বৌরানীর শাড়িখানি লুকিয়ে রাখল। ছোট

বৌরানী রাজকন্যার জীবন নেবে বলে জেদ ধরেছে মনে মনে। একটা কাককে ডেকে সে বলল "তোকে দুধ দেব ভাত দেব তুই আমার একটা কাজ করে দে।" কাক বলল "বল না কি কাজ।" "আমার শাড়ি দিয়েছি রাজকন্যাকে পরতে। এই শাড়িখানি তুই নোংরা করে রেখে আয়।" কেমন শাড়ি তার বর্ণনা দিল ছোট বৌরানী।

কাক সেই শাড়ির স্তূপের ভিতর থেকে ছোটবৌরানীর শাড়িখানা বের করে নোংরা করে অন্য শাড়ি চাপা দিয়ে রেখে এল। রাজকন্যার তো শাড়িব অবস্থা দেখে চক্ষুস্থির। এত যত্ন করে শাড়িখানা রেখে এ কা হল। খুব দুঃখিত মনে সে বাড়ি ফিরল। ছোটবৌরানী ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। ওকে দেখেই চিৎকার করে শাড়ির জন্য কান্নাকাটি করতে লাগল। তারপব রাজকন্যাকে মারধর করে গোমড়া-মুখে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ছোট রাজপুত্র দেখল বৌরানীর খুব রাগ হয়েছে। বৌরানী বলল "আমার শাড়ি নোংরা হয়ে গেছে। যতক্ষণ না ঐ শাড়ি তোমার বোনের রক্তে রাঙিয়ে দিচ্ছ ততক্ষণ আমি বিছানা থেকে উঠব না।" এই কথা ভাবতে রাজপুত্রের বুক ভয়ে কেঁপে উঠল কিন্তু বৌরানীর বাসনা তাঁকে পূর্ণ করতেই হবে। তার কাছে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার আশ্বাস পেয়ে বৌরানী পালঙ্ক থেকে নামলেন।

ছোট রাজপুত্র বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ছল করে রাজকন্যাকে বনের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তার শিরশ্ছেদ করলেন। তারপর সেই রক্তে বৌরানীর শাড়ি ভিজিয়ে আনলেন। রাজকন্যার মৃত্যুতে সবাই খুব মর্মাহত হল কিন্তু কেউ জানতে পারল না তার মৃত্যুর কারণ। রাজ-কন্যার মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল সেখানে একটা বিশাল ফলভারে নত

সুন্দর আমগাছ ছিল। এক বছর পরে রাজকন্যার শ্বশুর নাপিতকে দিয়ে রাজকন্যার গৌনার প্রস্তাব পাঠালেন। সে পথে একটা আমগাছ দেখতে পেল। মনে হল আমগাছের কাছ থেকে যেন কেউ কথা বলছে। ওর খুব কৌতূহল হল। সেখানে দাঁড়িয়ে নাপিত শুনল "শ্বশুরবাড়ির নাপিত এ গাছ ছুঁয়ো না, গাছের ডাল ছুঁয়ো না, গাছের পাতা ছুঁয়ো না। ভাজ বলেছে মারতে। ভাই মেরেছে বোনকে। বোনের রক্তে শাড়ি ভিজিয়েছে। ওখানে যেও না। ফিরে যাও।"

নাপিত ভয়ে ফিরে গেল। রাজাকে সব বলল। রাজা নিজে এলেন ঘোড়ায় চড়ে। সেই কণ্ঠস্বর বলে উঠল "শ্বশুরমশাই, গাছের ডাল ছোঁবেন না, গাছের পাতা ছোঁবেন না। রাজপুত্র বোনকে হত্যা করেছে। বৌরানী করতে বলেছে এই কাজ। ওখানে যাবেন না। চলে যান।"

রাজা ফিরে গেলেন এবং রাজপুত্রকে সব বললেন। রাজপুত্র এসে সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। রাজপুত্র আমগাছের দিকে চেয়ে বললেন "তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা? আমাকে দেখা দিচ্ছ না কেন?"

তখনই আমগাছ থেকে নেমে এল এক অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী কন্যা। ওমা, এই তো রাজকন্যা। রাজপুত্র তাঁর নববধূর নির্যাতনের কথা শুনে খুব দুঃখ পেলেন। তবু সে আবার জীবন ফিরে পেয়েছে দেখে সুখীও হলেন খুব। একটি সাজান সোনার পাল্কি এনে তিনি রাজার একমাত্র আদরের কন্যা, তাঁর নববধূকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গেলেন।

যাওয়ার আগে রাজকন্যা তার বাপের বাড়িতে এসে রাজা রানী রাজপুত্র ও বৌরানীদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। রাজকন্যা বেঁচে উঠেছেন দেখে সবাই খুশি হল শুধু ছোট বৌরানী সারা জীবন হিংসার জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন।

সেই চারজন কবি ও গোনু ঝা

বিহারের এক গ্রামে চারজন ব্রাহ্মণ ছিল। তারা ছিল নিরেট বোকা তাই তারা কোন কাজকর্ম পেত না। ভারী কষ্টে দিন কাটছিল তাই ওরা ঠিক করল রাজার সঙ্গে দেখা করে গান শুনিয়ে কিছু টাকা উপার্জন করবে। কিন্তু এই কাজ যে সোজা নয় মোটেই, সেই ধারণাটাই ওদের ছিল না। রাজদরবারে যাওয়ার সময় কতই না চিন্তা করল কিন্তু একটা বাক্যও রচনা করতে পারল না।

তারপর একেবারে হতাশায় ভেঙে পড়ে ক্লান্ত হয়ে ওরা একটা গুলার গাছ তলায় বসে পড়েছিল। এমন সময় একটা গুলার ফল গাছ থেকে খসে পড়ল। অমনি ওদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল "পক কর গুলার গির পড়ে" (গুলার ফল পেকে খসে পড়েছে) চার জনই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল "এই তো পদ্যের একটি চরণ হয়েছে। আরম্ভ তো করেছি।"

একটু জিরিয়ে নিয়ে ওরা আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। আরও তিনটি চরণ চাই পদ্যটি সম্পূর্ণ করে রাজার বাড়িতে যেতে।

পথে একজন স্ত্রীলোক একটি পিপল গাছের তলা থেকে কিছু পিপল পাতা তুলে নিল। ওদের মধ্যে আরেকজন ব্রাহ্মণ বলে উঠল

"লাঈ পিপর নারী।"

এইবারে ওদের মনে বেশ বল পেল ওরা। আর দুটি চরণ তৈরী করতে পারলেই কেল্লা ফতে।

প্রাসাদের দিকে ওরা হেঁটে চলেছে। চোখে পড়ল একটা জামগাছ ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। গাছের তলাটা বেগুনী রঙের জামে ছেয়ে আছে। তৃতীয় ব্রাহ্মণ বলল "জামন অন্ত না পায়ে" (জাম ফলের অন্ত নেই)।

এইবার ওরা বেশ খুশি হয়ে উঠেছে। তবু মনে ভয়। চারজনকেই তো একটু কিছু বলতে হবে তা না হলে রাজা ওদের পয়সা কড়ি দেবেন কেন? এমন সময়, বরাত জোরে দুটি বালক পথে মারামারি করতে লাগল। চতুর্থ ব্রাহ্মণ তখন বলে উঠল "বরবস ঠানো রাঢ়ি (বৃথাই লড়ছে ওরা)। ওরা খুব খুশি, চারটি চরণ চার জনে রচনা করেছে।

খুব আনন্দিত হয়ে ওরা রাজদরবারে গেল। ওরা ব্রাহ্মণ তাই রাজা সসম্মানে অভ্যর্থনা করে ওদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ওরা বলল ওরা কবি। রাজা তখন ওদের রচিত কিছু শ্লোক শুনতে চাইলেন। ওরা চারজনে যে চারটি চরণ রচনা করেছে তাই শোনাল। রাজা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। পণ্ডিতরা, মন্ত্রীমশাই সভাসদরা সবাই রাজসভা কাঁপিয়ে হেসে উঠল এই অদ্ভুত শ্লোক শুনে।

কিন্তু রাজার বয়স্য গোনু ঝা রাজসভায় আসেন নি। রাজা গোনু ঝার খুব বন্ধু ছিলেন। রাজা তাকে খুব বিশ্বাস করতেন। তাই রাজা সেদিন কবিদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করলেন না। ব্রাহ্মণদের পরদিন রাজসভায় আসতে বললেন।

ব্রাহ্মণরা পরদিন সভায় এসে ঐ চারটি চরণ আবার আবৃত্তি

করলেন। গোম্বু ঝা দেখলেন এই ব্রাহ্মণ চারজন যেমন মূর্খ তেমনি দরিদ্র, এদের কিছু অর্থাগম হওয়া দরকার। তাই তিনি বিশেষ গাম্ভীর্য অবলম্বন করে বললেন "মহারাজ এই শ্লোক রাবণের উদ্দেশ্যে রচিত।" তারপর গোম্বু ঝা ব্যাখ্যা করলেন "পক কর গুলার গির পড়ে (রাবণের রাজ্য একটি পাকা গুলার ফলের মতো খসে পড়ল। লাঈ পি পর নারী (সীতা যিনি পরস্ত্রী তাকে তিনি অপহরণ করতে এসেছিলেন) জা মন অন্ত না পায়ে (সেই অনন্ত যাঁকে আমাদের মন ধরতে ছুঁতে পারে না) বরবস ঠানো রাঢ়ি। (বৃথাই রাবণ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

সমস্ত রাজসভা এই ব্যাখ্যায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। পণ্ডিত ও সভাসদ্‌রা শ্লোকের অর্থ খুঁজে পায় নি বলে মনে অশান্তি বোধ করল। রাজা এত গভীর অর্থপূর্ণ শ্লোক রচনা করেছে জেনে ব্রাহ্মণদের উপর বিশেষ প্রীত হলেন। প্রত্যেককে এক থলি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। তারা গ্রামে ফিরে গেল।

যাবার আগে গোম্বু ঝা ওদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন "ওহে তোমরা যে কত বড় মূর্খ সে ভালই বুঝেছি। টাকা পয়সা পেয়ে গেছ কিছু, জীবনে কিন্তু এ মুখো হয়ো না আর।"

সেই লুকিয়ে রাখা রাজকন্যা

অনেকদিন আগেকার কথা। বিহারের এক রাজা বারান্দায় দাঁড়িয়ে-ছিলেন সকালবেলা। দেখলেন এক ঝাড়ুদারনী রাজাকে দেখে থুতু ফেলল। রাজা তো রেগে আগুন। তখনই তাকে পেয়াদা পাঠিয়ে

ডেকে আনলেন। ঝাড়ুদারনী ভয়ে কাঁপছে। ওদের কাউকে তো কখনও রাজামশায় ডাকেন না। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি থুথু ফেললে কেন?" একটু চুপ করে থেকে সে বলল "মহারাজা থুথু ফেলার কোন কারণ নেই। এমনি ফেলেছি।" রাজা বললেন "দেখ সত্যি কথা বলো নইলে কিন্তু শাস্তি পাবে।" তখন ঝাড়ুদারনী আরো ভয় পেয়ে বলে ফেলল "মহারাজ, আপনার কোন ছেলেমেয়ে নেই, সকালে আপনাকেই প্রথম দেখলাম তাই···নিঃসন্তান কোন লোককে সকালে উঠেই দেখলে দিন বড় খারাপ যায়।" রাজা তাকে কোন শাস্তি দিলেন না। রাজার তো কোন দুঃখ নেই এই এক দুঃখ ছাড়া। কত পূজা পাঠ শান্তি স্বস্ত্যয়ন করলেন কিছুই হল না।

রাজার মন এত ভেঙে গেল রাজা মাঝরাতে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। একটি দাসী তাঁকে দেখতে পেয়ে পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার জন্যই বলল "মহারাজ, দয়া করে চলে যাবেন না, মহারানী মা হতে চলেছেন। রাজা ফিরে এলেন। কিন্তু রানী ও তাঁর সখীরা বড়ই বিপদে পড়লেন—এখন কি হবে? রানী একজন জ্যোতিষীকে ডাকলেন। তিনি রাজাকে ডেকে বললেন "মহারাজ, আপনি একটি অতি সৌভাগ্যবতী কন্যালাভ করবেন। কিন্তু কন্যার জন্মের আগে আপনি মহারানীর সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করবেন না। অন্যথায় কন্যাটি মৃত জন্মাবে।" রাজা জ্যোতিষীর কথা অমান্য করলেন না। কিন্তু মনে খুব দুশ্চিন্তা রইল তাঁর। তারপর রাজা খবর পেলেন তাঁর একটি কন্যালাভ হয়েছে। জ্যোতিষী বললেন "কন্যার বিবাহের আগে তার সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করবেন না মহারাজ।" রাজার ধৈর্য থাকছে না তবু জ্যোতিষীর কথা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। কোন

বিপদের ঝুঁকি নেওয়া তাঁর ইচ্ছা নয়।

এদিকে রানী একটি পাখি কিনেছেন, তার পায়ে ঘুঙুর পরিয়ে দিয়েছেন। পাখি নড়লেই ঝুমঝুম করে ঘুঙুর বাজে। রানী আর তাঁর সখীরা রাজাকে বলেন "ঐ আপনার মেয়ে হাঁটছে মহারাজ। পায়ে ঘুঙুর বাজছে।" রাজা কত রকমের পোশাক আনলেন, কত রকমের গয়না আনলেন মেয়ের জন্য। কিন্তু হায় মেয়েকে চোখে দেখলেন না কোন দিন। রাজার একমাত্র লক্ষ্য হল একবার তাঁর কন্যার দেখা পাওয়া। তারপর মেয়ের জন্মের পর বারো বছর পার হয়ে গেলে তিনি মেয়ের বিয়ে ঠিক করলেন।

খুব ধুমধাম করে বারাত এল। প্রাসাদ সাজান হল কাগজের মালা আর আলো দিয়ে। সানাইয়ে বাহার রাগ বাজতে লাগল। এইবার এল রানীর দারুণ সঙ্কট। জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করায় জ্যোতিষী বললেন "রানীজি রাজকন্যা যেন বিবাহ বাসরে স্বয়ং না আসেন। যদি আসেন তাহলে আর তিনি বাঁচবেন না।" রাজকন্যার বদলে একটি লোটা (ঘটি) রেখে বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু বিদার (শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময়) কী হবে? এইবার রানী খুব সাহসের পরিচয় দিলেন। রাজপুত্রকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন "বাছা আমার, এই পাখিটিকে আমি সন্তানের মতো বড় করে তুলেছি। তোমার হাতে একে তুলে দিচ্ছি। একে মমতায় রেখো, দেখো কেউ যেন ওকে দুঃখ না দেয়।" এই কথা বলতে গিয়ে রানী কেঁদে ফেললেন। রাজপুত্রের মন খুব নরম হয়ে গেল। তিনি কথা দিলেন যে, পাখিটিকে তিনি দেখবেন।

রানীর মহলের সামনে কনেকে নিয়ে যাওয়ার ডোলি এল।

চুপিচুপি পাখির খাঁচাটা ডোলিতে তুলে দিল রানীর সখীরা।

রাজপুত্র নিজের প্রাসাদে ফিরে এসে বললেন "নতুন বৌরানীকে যেন কেউ বিরক্ত না করে।" রানীমা একটু অবাক হয়ে গেলেন কিন্তু রাজপুত্রের গম্ভীর মুখ দেখে কিছু বলতে সাহস পেলেন না।

রাজপুত্র নিজের শয়নকক্ষে পাখির খাঁচাটি রাখলেন। সেখানে কারুর প্রবেশ নিষেধ ছিল। নিজেই তিনি পাখিটিকে খাওয়াতেন।

এইবার ছোট রাজকুমারের বিবাহ হবে। রাজপরিবারের সব মেয়েরাই বিবাহের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। শুধু বড় রাজকুমারের পাখী বৌ নিজের ঘর ছেড়ে আসে না। রানীমা বললেন "এখন তো বড় বৌরানীর ঘরের বাইরে এসে সবার সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করার সময় হয়েছে। তাকে এবার ছাড়ো।" রাজপুত্র বললেন "মা রাজপ্রাসাদে কি দাসীর অভাব হয়েছে যে আমার বৌ কাজ করবে।"

"তা নয় বাছা। বাড়ির মেয়েরা এই সব মাঙ্গলিক কাজ করে, এটাই নিয়ম। আসুক না সবার সঙ্গে একটু ধান ভানুক না।" রাজপুত্র বললেন "মা ও কোনদিন কোন পরিশ্রমের কাজ করে নি আর তুমি ওকে বলছ ধান ভানতে। দেখি, ওকে বলি।"

পাখিকে রাজপুত্র সব বললেন। তখন সে রাজি হল। পাখিটি উড়ে গিয়ে অনেক পাখিদের ডেকে এনে ধানের খোসা তুলে চাল বানিয়ে দিল রাতারাতি।

এইবার রাজপুত্র যাবেন বারাত নিয়ে ছোট ভাই-এর বিবাহে। তাঁর খুব চিন্তা হল কে দেখবে পাখিটিকে তিনি না থাকলে? পাখি বলল "তুমি আমার সাতদিনের খাবার আর জল রেখে যাও। আমি বেশ থাকব।"

কিন্তু পাখি জলের বাটিটি উল্টে ফেলল অসাবধানে। তখন খাঁচার দরজা খুলে নিজের ছোট্ট বাটিটা নিয়ে জল আনতে চলল। পুকুর থেকে জল তুলে ছোট্ট পাখিটি কিছুতেই পারছে না জলশুদ্ধ বাটিটা ঠোঁটে করে নিয়ে আসতে। এই সময় শিবপার্বতী সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। পাখিটির দুঃখে বিগলিত হয়ে পার্বতী শিবকে বললেন "দেবাদিদেব আপনি এই পাখিটির দুঃখমোচন করুন। আমি আর সইতে পারছি না।" শিব তখন পার্বতীকে বললেন "দেবী তোমার কনিষ্ঠা কেটে পাখিটির মাথায় এককোঁটা রক্ত ফেল।" যেই পার্বতীর কনিষ্ঠা থেকে একবিন্দু রক্ত ঝরে পড়ল পাখিটির মাথায় অমনি সে হয়ে গেল এক লাবণ্যবতী যুবতী। সে দেবীর পদতলে লুটিয়ে পড়ল। দেবী তাকে আশীর্বাদ করলেন "সুখী ও স্বামী সোহাগিনী হও। যাও মা তোমার স্বামীগৃহে ফিরে যাও।"

ছোট রাজকুমার বিবাহ করে প্রাসাদে ফিরে এলেন। বড় রাজকুমার প্রাসাদে এসেই তার পাখির কি দশা হয়েছে দেখতে নিজের শয়নকক্ষে চলে গেলেন অবিলম্বে। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যখন বধূবেশে সজ্জিত অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী এসে তাঁকে প্রণাম করল। বুঝতে বাকি রইল না যে, এই তাঁর সেই পাখি-বৌ। তিনি তাকে গভীর আলিঙ্গন করলেন।

রাজপুত্র তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে আত্মীয় বান্ধব সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলেই সুন্দরী বৌরানীকে দেখে ধন্য ধন্য করল।

মণিহার

অনেককাল আগে বিহারে দু'জন বণিক ছিল। একজনের নাম ছিল করোড়িমল কারণ তার ছিল কোটি কোটি টাকা ; অন্যজনের নাম ছিল লাখপত কারণ সে ছিল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। লাখপতের সাধ ছিল লোকে তাকে বলে "বড়ে শেঠজী" কিন্তু করোড়িমল থাকাতে তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার নয়।

করোড়িমলের একটা মণিহার ছিল তার লক্ষ লক্ষ টাকা দাম আর তার কারুকাজেরও তুলনা ছিল না। বিস্তর মণিরত্নে খচিত সে এক অপূর্ব হার। লাখপতের ইচ্ছা হল নিজের পুত্রের বিবাহে সে এই হারটি পরবে।

করোড়িমলের কাছে হারটা চাইতে সে দিল পরতে। কথা হল যখন পুত্র নববধূ নিয়ে ফিরে আসবে তখন লাখপত হার ফেরৎ দেবে। কনের বাড়ির লোকেরা মণিহারটির বিস্তর প্রশংসা করল তাতে লাখ-পতের মন গেল বদলে। হার ফেরৎ দেওয়ার ইচ্ছা আর তার রইল না।

পুত্র বিবাহ করে ফিরে আসার পর তিনদিন কেটে গেল লাখপত হারটি ফেরৎ দিল না। চতুর্থদিন করোড়িমল তার মুনিমকে পাঠাল লাখপতেব কাছ থেকে হারটি ফেরৎ নেওয়ার জন্য। মুনিমজী এসে লাখপতকে বলল "শেঠজী, আমার শেঠজী তাঁর মণিহারটি আপনাকে ফেরৎ দিতে বলেছেন কারণ তিনি নিজেও একটি বিয়ের নিমন্ত্রণে যাবেন।"

লাখপত অবাক হওয়ার ভান করে বলল "কোন হার? কী বলছেন আপনি? আমি নিজে উনি যখন দোকানে ছিলেন তখন ওঁর

হাতে হার ফেরৎ দিয়ে এসেছি।"

মুনিমজী জানতেন হার কোনদিনই লাখপত ফেরৎ দেয় নি কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে রইলেন।

ফিরে এসে করোড়িমলকে সব জানালেন। করোড়িমল বুঝতে পারলেন এ হার আদায় করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি রাজার কাছে নালিশ করলেন। তখন রাজা করোড়িমলকে বললেন "আমার রাজ্যে এরকম ক্ষেত্রে তিনটি পরীক্ষা নেওয়া হয়।" রাজার কাছে লাখপতের ডাক পড়ল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি করোড়িমলের হার নিয়েছ?" "হাঁ মহারাজ নিয়েছিলাম কিন্তু ফেরৎ দিয়েছি তো।" রাজা করোড়িমলকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে বললেন। করোড়িমল বললেন "মহারাজ, হার এখনও লাখপতের কাছেই আছে। আমি আর কী প্রমাণ দিতে পারি? আপনি পরীক্ষা নিয়ে দেখুন।"

রাজা রাজী হলেন। লাখপতকে একখানা ঘরে সাতটি তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হল। দেবী দুর্গা এই ঘরে এসে অপরাধীকে শাস্তি দেবেন। দিনের শেষে দেবী দুর্গা এলেন। লাখপতকে জিজ্ঞাসা করলেন "করোড়িমলের হার তোমার কাছে আছে? লাখপত বলল "হ্যাঁ মা, আছে।" "তুমি ওটা কেন ফেরৎ দিচ্ছ না?" "হাঁ, মা ফেরৎ দেব নিশ্চয়ই! পরের সম্পত্তি নিয়ে কি আমি বড়লোক হব মা?" লাখপত বলল মা দুর্গাকে। দেবী আদেশ করলেন "তুমি ঐ মণিহার আজই ফেরৎ দাও।" লাখপত বলল "নিশ্চয়ই!" দেবী দুর্গা বললেন "তুমি আজই যদি না হার ফেরৎ দাও তাহলে কাল আমি আবার আসব আর তোমাকে শাস্তি দেব।" লাখপত বলল "নিশ্চয়ই মা, তুমি আমাকে শাস্তি দিও, তুমি যদি অপরাধীদের শাস্তি না দাও

তাহলে তো পৃথিবী রসাতলে যাবে।"

দেবী লাখপতের উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন। পরদিন ঘরের দরজা খুলে দেখা গেল লাখপত সুস্থ ও সুখী। লোকে লাখপতের সুখ্যাতি করতে লাগল উচ্ছ্বসিত হয়ে।

রাজা করোড়িমলের পরামর্শ চাইলেন "এবার কি করা যায়?" করোড়িমল বলল বাকী দুটি পরীক্ষাও নেওয়া হোক। এবার লাখপতকে একখানা অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখা হল। সেই ঘরে ছিল একটা কেউটে সাপ আর তার বৌ। তারা অপরাধীকে দংশন করবে কিন্তু নিরপরাধ হলে কিছু ক্ষতি করবে না। লাখপত ছিল খুব সতর্ক। চাদরের তলায় লুকিয়ে নিয়ে গেল একবাটি ভর্তি দুধ। সাপ দুটি আসতেই তাদের দুধ পান করতে দিল। তারা দুধ পান করে খুশি হয়ে চলে গেল ওর দিকে ফিরেও চাইল না।

এবারেও লাখপতকে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। রাজা করোড়িমলকে বললেন "আরও একটি পরীক্ষা আছে।" কিন্তু করোড়িমল বলল "মহারাজ এটা হচ্ছে কলিযুগ এখন মিথ্যারই জয়-জয়কার তবে তৃতীয় পরীক্ষাটি নিলেই অবশ্য আমি সন্তুষ্ট হব।"

একটা জ্বলন্ত লৌহগোলক লাখপতকে ধরতে হবে। গোলকটি ধরবার সময় লাখপত বলতে লাগল "যদি হার তার মালিকের কাছে থাকে তাহলে এই আগুন চন্দনের তুল্য শীতল হয়ে যাবে আর হার যদি আমার কাছেই থাকে তাহলে আমি যেন পুড়ে ঝামা হয়ে যাই।"

অগ্নিগোলক চন্দনের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এবার সমবেত জনতা করোড়িমলকে চিৎকার করে ধিক্কার দিতে লাগল।

করোড়িমল লজ্জায় মাথা তুলতে পারল না। লাখপত করোড়ি-

মলের কাছে এক কলসি জল রেখেছিল যদি তৃষ্ণার্ত হয় তাহলে পান করবে। এবার বিদায় নেবার সময় সে কলসিটি নিয়ে এল করোড়ি-মলের কাছ থেকে। কিন্তু হঠাৎ হাত ফসকে কলসিটি টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সেই কলসির ছড়ানো টুকরোর সঙ্গেই রয়েছে সেই অপূর্ব মণিহার। এবার লোকেরা করোড়িমলকে ধন্য ধন্য করে ধ্বনি দিল "সত্যকী জাড় সদা হরি, পুণ্যকী জাড় সদা হরি।"

সালাহেস

কেওলাগড়ের রাজা ভীমসেনের প্রহরী ছিল সালাহেস।

দোনা মালিনী একদিন নদীতে স্নানরত সালাহেসকে দেখে তার সুন্দর পৌরুষদীপ্ত রূপে মুগ্ধ হল। সখীদের সালাহেসের কাছে পাঠাল দোনা, যেন সালাহেস তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু সালাহেস অনেক বীরত্বপূর্ণ কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় দেখা আর করে না। দোনা মোরাঙ্‌ গ্রামে একটি বাগান করেছিল। সেখানে ও আম, শিমূল, কদম, কাচনার পলাশ গাছ পুঁতেছিল, ফলে আর ছায়ায় বাগান ভরা ছিল স্নিগ্ধতায়। বেলি চামেলীর ফুলের গন্ধে সে বাগান ছিল সুরভিত। 'সাঁচি' পানের 'বরজ' করেছিল।

'সোলহ্‌ সিংগার' করে দোনা বসে থাকত সালাহেসের জন্য কিন্তু সালাহেস কোনদিনই এল না। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিল। সে কৃশ তনু হয়ে গেল, তবু সালাহেস এল না।

এদিকে সালাহেসের ভীষণ বিপদ হল। সালাহেস প্রহরায় থাকার সময়ই মোকামাগড়ের চোর চুহাড়মল, সে আবার জগৎ নামক

চোরের ভ্রাতুষ্পুত্র, ভীমসেনের রানী হংসবতীর শয়নকক্ষে ঢুকে পড়ল।

অন্ধকার সেই রাত। চুহাড়মল নিজের চুল শক্ত করে বেঁধে শরীরে অনেকগুলি ছুরি বেঁধে বুকে ঢাল লাগিয়ে, বুকে বাঁধা ছুরি দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রানী হংসবতীর শয়নকক্ষ পর্যন্ত প্রায় দু মাইল সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সেই সুড়ঙ্গের উপর মাটিচাপা দিয়ে দিল। তারপর রানীর ঘরে প্রবেশ করল। রানীর ঘরের দেওয়াল সোনার, রানীর ঘরের মেঝেও সোনার। রানীর গলার হীরার হার খুলে নিল চুহাড়মল তারপর রানী হংসবতীকে মেঝেতে শুইয়ে রেখে সোনার খাট আর হীরার হার নিয়ে পালিয়ে গেল। রানী ঘুম ভেঙে দেখলেন তিনি মেঝেয় পড়ে আছেন, তাঁর গলার হীরার হারটিও নেই।

রানী রাজাকে খবর পাঠালেন দাসীদের দিয়ে।

সব শুনে রাজা হুকুম দিলেন সালাহেসকে ধরে আনতে। সালাহেসকে পাওয়া গেল না তখন। যখন তাকে পাওয়া গেল সে তখন মদ্যপান করে মাথায় পাগড়ী বেঁধে হাতের তেলোয় গাঁজা দলছে।

যখন সে রাজা ভীমসেনের কাছে এল তখন চোর সটকে পড়েছে। রাজা সালাহেসকে অত্যন্ত তিরস্কার করলেন কিন্তু সালাহেসের পক্ষে চোরকে ধরা সম্ভব হল না।

রাজার আদেশে সালাহেসের পদচ্যুতি ঘটল চোর ধরতে পারে নি সেই কারণে।

এইবার দৌনা মালিনী সালাহেসের সাহায্যে এগিয়ে এল। দৌনা যাদু ও ডাকিনীতন্ত্র জানত। সে তার একজন সখীকে সালাহেসের কাছে পাঠাল এই বার্তা দিয়ে যে, সে চোরকে খুঁজে বার করবে। যাদু-বিদ্যার সাহায্যে সে চোরকে খুঁজে বার করল। সালাহেস এবং দৌনা

চোরকে ধরবার জাল বিছাল। সালাহেস ভাই মতিরামকে এবং ভাইপো করিকস্তকে আনল আর আনল সাতশ হাতি চুহাড়মলকে ধরবার জন্য।

চুহাড়মল পঞ্চাশহাত লাফিয়ে চলে এল হাতিগুলির সামনে আর সালাহেসের সঙ্গে যুদ্ধ করল। সালাহেস আর তার দলবলের সঙ্গে চুহাড়মল এমন ভাবে লড়াই করল যেন একটা নেকড়ে একপাল ছাগলের সঙ্গে লড়ছে। একসঙ্গে সাতশ হাতি কেটে ফেলল। তিনদিন তিনরাত্রি অবিরত যুদ্ধ করে সালাহেসকে পরাজিত করল চুহাড়মল।

সালাহেস এখন নিতান্তই অসহায়। তার সব লোক আর সব হাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। নিজের আশাহীন ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দৌনা সালাহেসের এই দুঃখ ও হতাশা সইতে পারল না। সে পাঁচদিন পাঁচরাত্রি অবিরত নির্জলা অনাহারে দেবী পার্বতীর দয়া ভিক্ষা করল।

দেবী সন্তুষ্ট হলেন এবং সালাহেস চুহাড়মলকে কীভাবে পরাজিত করবে দৌনাকে তা বলে দিলেন।

চুহাড়মহল বনের মধ্যে লুকিয়েছিল। মদ্যপান করে পীপলগাছের তলায় রানীর সেই সোনার পালঙ্ক পেতে শুয়েছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় সালাহেস তার উপর লাফিয়ে পড়ে তার হাত পা বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে রাজা ভীমসেনের রাজসভায় নিয়ে চলল, সঙ্গে সেই সোনার পালঙ্ক। রাজসভায় এসে ভয়ে চুহাড়মল বলে ফেলল যে পীপল গাছের নীচে ও ঘুমোচ্ছিল তারই তলায় পোঁতা আছে রানীর হীরার হার।

রানী হংসবতীর হীরার হার সোনার পালঙ্ক ফিরে পেয়ে আনন্দের

সীমা রইল না। তিনি সাল্‌হেস এবং দৌনাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

দৌনা যে সালাহেসের প্রতি অনুরক্ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করলেন।

রাজা ভীমসেনের প্রাসাদে খুব ঘটা করে সালাহেসের সঙ্গে দৌনার বিবাহ হল। তারপর তারা চিরদিন সুখে জীবন কাটাতে লাগল।

তিলমঞ্জনী কুমারী

চারাভুসাকো আর তিলমঞ্জনী দুই বোন। মিথিলার এক ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিল ওরা। চারাভুসাকোর নিজের মা। তিলমঞ্জনীর মা মারা গেছেন যখন সে খুব ছোট। চারাভুসাকোর মা তার সৎমেয়ে তিলমঞ্জনীকে মোটেই পছন্দ করত না। তিলমঞ্জনীর সুন্দর চেহারা, মিষ্টি স্বভাব আর চারাভুসাকো দেখতেও ভাল না, তার স্বভাবও রুক্ষ।

সৎমা তিলমঞ্জনীকে দিনরাত খাটাত। সারাদিন যাঁতায় গম পেষবার পর সন্ধ্যাবেলা তাকে একখানা চাপাটি আর একটুখানি ডাল দিত খেতে। কোনদিন হয়ত রোদজ্বলা দুপুরে তিলমঞ্জনীকে হুকুম করল নদী থেকে জল তুলে আনতে। প্রায় সব দিনই সবার পাতের উদ্বৃত্ত খাবার দিত সৎমা তাকে খেতে।

কিন্তু তিলমঞ্জনীর রূপের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একদিন এক নাপিত এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত এক রাজার সঙ্গে তিলমঞ্জনীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এল তিলমঞ্জনীর বাবার কাছে। তিলমঞ্জনীর বাবা

গরীব ব্রাহ্মণ এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে দ্বিধা করছিলেন কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মণী খুব আগ্রহ দেখালেন এই বিবাহে। বিবাহ স্থির হয়ে গেল। তিলমঞ্জনীর বাবা রাজার কাছে গিয়ে ধানবত্তী করলেন। ধানবত্তীতে রাজা ও ব্রাহ্মণ ত্নজনেই ত্ন' মুঠো ধান নিয়ে এলেন। সেই ধান মিশিয়ে ত্ন'জনে ভাগ করে নিলেন। রাজা কম্বই (কনের শাড়ি) জরি ও রেশমে বোনা এবং গহনা পাঠালেন কনের জন্য। মাথায়, টায়রা, মাঙ্গটিকা, গলায় মালা হাঁসুলি, কানে ঝুমকা, বাহুতে অনন্ত, কব্জীতে পহুঁচি আর বালা, পায়ে পানজেব এ সব পাঠালেন।

ব্রাহ্মণের বাড়ি আলো দিয়ে সাজানো হল। মাডোয়া (ছাদনাতলা) ফুল দিয়ে সাজানো হল। সানাই বাজছে। কিন্তু বেচারা তিলমঞ্জনী। তার মতো ত্নঃখী কে আছে ? তারই বিয়ে কিন্তু সে কোথায় ? কুটিল সৎমা তার কানে ঢুকিয়ে দিয়েছে যাত্নমন্ত্র পড়া গাছের শিকড় তাতে সে একটি ছোট পাখি হয়ে গেছে। সৎমা সেই পাখিকে একটি খাঁচায় বন্ধ করে রেখেছে।

রাজার মুখ সেহরা দিয়ে ঢাকা। তাছাড়া রাজা কনেকে আগে দেখেন নি কাজেই যখন তিলমঞ্জনীর পরিবর্তে চারাভুসাকোর সঙ্গে রাজার বিবাহ হয়ে গেল তিনি ধরতেই পারলেন না যে তিনি ঠকেছেন। রাজা তার সিঁথিতে সিঁত্নর দিলেন তারপর গৃহদেবতা শিবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। ত্নজনে স্বামী স্ত্রী হয়ে গেলেন।

প্রাসাদে এসে রাজা দেখলেন তার রানী কুৎসিত। যেমনটি শুনে ছিলেন তিলমঞ্জনীর রূপের কথা তার কিছুই নেই। নেই চোখে চমকে ওঠা হরিণের চাহনি, নেই গলানো সোনার মত গায়ের রঙ যা তিনি শুনেছিলেন, নেই সেই গোড়ালি ছোঁয়া একঢাল চুল কালো মেঘের মত,

যা জেনেছিলেন।

তাছাড়া রানীর মেজাজ রুক্ষ, অত্যন্ত স্বার্থপর। তিনি রাজার কাছে শাড়ি গহনা ভাল খাবার এই সব চাইতে লাগলেন। রাজার প্রতি কোন ভালবাসা বা মমতা তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেল না। রাজা তার নববধূর সম্পর্কে খুবই হতাশ হয়ে গেলেন।

এদিকে নিজের মেয়ের রাজার সঙ্গে বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর তিলমঞ্জনীকে তার সৎমা মুক্ত করে দিল। এখন তিলমঞ্জনী একটি ছোট্ট পাখি। অনেক দূর উড়ে সে এসে পৌঁছল তার সৎবোন চারাভুসাকো যেখানে রানী হয়েছে সেই রাজ্যে। তিলমঞ্জনী রাজার প্রাসাদের চারদিকে উড়ে উড়ে গাইতে লাগল ঃ

তিলমঞ্জনী ফিরতি দারি দারি
চারাভুসাকো ভোগথি রাজ
ধন এহি রাজাকে কহি ঔর হী
জেঠ সালি সঙ্গ করহি বিলাস।

রাজা যখন রাজসভায় রাজকার্য করতেন তখন পাখিটি এই গান গাইত। রাজা যখন উষাকালে স্নান সেরে সূর্য প্রণাম করতেন তখনও পাখি এই গান গাইত।

রাজার বড় কৌতূহল হল। একজন অনুচরকে বললেন পাখিটিকে ধরে আনতে।

পাখিটি খুব সুন্দর—টিয়াপাখি তাজা সবুজ রঙ গায়ের, চুনি রঙের ঠোঁট আর মস্ত বড় লেজ। রাজা নিজের হাতে পাখিটিকে ধরলেন। রাজার মুঠোয় ঝটপট ঝটপট করতে করতে ওর কান থেকে সেই যাদুকরা শিকড়টি বেরিয়ে এল।

রাজা বিপুল আনন্দে এবং বিস্ময়ে দেখলেন তুলনাহীনা সুন্দরী এক কন্যা দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে। লজ্জারুণ মুখ। তার চোখের জল ঝরছে অবিরল। রাজা তার সব কথা শুনলেন। তারপর চারাভুসাকোকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কেন তাকে ঠকিয়েছে। চারাভুসাকো লজ্জায় ভয়ে মাথা তুলতে পারল না। রাজার আদেশে তাকে বনে পরিত্যাগ করে এল রাজার অনুচর।

তারপর রাজা আর তিলমঞ্জনী একশ বছর সুখে কাটালেন।

সীতার নির্বাসন

রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করে এনেছেন রাবণের কবল থেকে। অযোধ্যা-পুরী আনন্দ কোলাহল মুখরিত। কিছুদিন আলোর মেলায় সানাই-এর বাজনায় রামচন্দ্রের অভিষেক উৎসবের রেশ লেগে রইল। রাজ্যে সুখ-শান্তি ফিরে এল।

কিন্তু সুখ কি মানুষের ভাগ্যে সয়? অযোধ্যার অন্তঃপুরে একদিন সীতাদেবী অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের কাছে তার নির্বাসনের দুঃখের কাহিনী বলছেন এমন সময় তাঁর ননদ বললেন "বৌদি, তুমি রাবণের একটা ছবি আঁকো না। আমার জানতে ইচ্ছা করে রাবণ কেমন দেখতে।" সীতা বললেন আমি অশোক বাটিকায় ছিলাম বটে কিন্তু রাবণকে কোনদিন দেখিনি এমন কী সেই দুর্বৃত্তের ছায়াও দেখিনি চোখ মেলে।" "না দেখলেও তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ সে কেমন দেখতে?" "তা শুনেছি। সে তো রাক্ষস। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তার দেহ, বিরাট তার আকৃতি। দশানন সে। তার দশমুখে বীভৎস অহংকারী চোখ আর

বিকট দাঁতের সারি।” “আঁকো না একটু যেমন শুনেছ তার বর্ণনা তেমনি করে।” সীতা আঁকতে চান না রাবণের ছবি তবুও ননদ পীড়াপীড়ি করে। শেষকালে সীতা আঁকলেন রাবণের একখানি কল্পিত ছবি।

রামচন্দ্র অন্তঃপুরে আসতেই লজ্জিতা সীতা সেই ছবি আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেললেন। রামচন্দ্রেরও কৌতূহল হল সেই ছবি দেখবার। সীতা তবু দেখালেন না। তাঁর ননদ জোর করে সেই ছবি কেড়ে নিয়ে রামচন্দ্রকে দেখাল। শুধু তাই নয় রামচন্দ্রকে তার বোন বলল “দাদা, দেখছ ? বৌদি এখনও রাবণকে ভুলতে পারেনি।”

রাগ করে, অভিমান করে রাম সেখান থেকে চলে গেলেন। সীতাকে তিনি কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। একান্তে লক্ষ্মণকে ডেকে রাম বললেন “লক্ষ্মণ তোমার বৌদি রাবণকে এখনও ভুলতে পারেননি। আমি আর তাঁর সঙ্গে ঘর করতে চাই না। তাঁকে তুমি নির্বাসনে দিয়ে এস।” লক্ষ্মণ বললেন “আপনি বলছেন কি দাদা ? বৌদি সতী সাধ্বী ! আপনি ছাড়া তিনি আর কারো কথা কখনও মনেও আনেন না। তাছাড়া তিনি মা হতে চলেছেন। তাঁকে নির্বাসনে দিতে আমি পারব না দাদা !” ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র বললেন “আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আমার আদেশ তোমাকে পালন করতে হবে।”

পরদিন প্রভাতে বিষণ্ণমনে লক্ষ্মণ গিয়ে সীতাকে বললেন “বৌদি আপনি তো অনেকদিন বাপের বাড়ি যাননি। ওখানে আপনার নিমন্ত্রণ হয়েছে। চলুন আপনাকে ওখানে রেখে আসি। কিছুদিন থাকবেন।”

সীতা সতী ছিলেন। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিলোকের সব কথাই ছিল তাঁর জানা। তিনি সবই বুঝতে পারলেন। বললেন “ভাই লক্ষ্মণ

আমার বাপের বাড়িতে তো কেউ নেই। বাবা মা দুজনেই স্বর্গত। চল, তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যেতে চাও, নিয়ে চল। আমি আর এখানে থাকব না।"

মর্মাহত লক্ষ্মণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। যাবার সময় সীতা ননদকে অভিশাপ দিলেন "তুমি আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ঘরছাড়া করলে তুমি চাতক পাখি হবে। তুমি সর্বদা তৃষ্ণার্ত থাকবে। যেখানে তুমি যাবে, নদী শুকিয়ে যাবে, সাগর শুকিয়ে যাবে জীবনভর তুহি হা-জল হা-জল করে ছটফট করবে।"

চোখের জল ফেলতে ফেলতে সীতা লক্ষ্মণের সঙ্গে গিয়ে রথে উঠে বসলেন। যাবার সময় সীতা তাঁর আঁচলের প্রান্তে সরিষা বেঁধে নিয়ে গেলেন। রথ থেকে সেই সরিষা পথে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন সীতা। বললেন "সরিষা কণা তোমরা আমার সোদরোপম দেবর লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে দিও। তিনি যাতে অযোধ্যার প্রাসাদে ফিরে যেতে পারেন।"

দুটি বন অতিক্রম করে তাঁরা তৃতীয় বনে এসে থামলেন। সীতা বললেন "ভাই লক্ষ্মণ আমি বড় তৃষ্ণার্ত। একটু জল খাওয়াও।" লক্ষ্মণ জলের সন্ধানে গেলেন। সীতা একটি চন্দনগাছের তলায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ একটি শালপাতার পাত্রে জল এনে দেখলেন দুঃখিনী সীতা ক্লান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। এই সুযোগে লজ্জিত লক্ষ্মণ সীতাকে বনের মধ্যে ত্যাগ করে ফিরে গেলেন অযোধ্যায়।

সীতার জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বুঝতে পারলেন লক্ষ্মণ চলে গেছেন চিরকালের মতন। সীতা দুঃখ করে বললেন "লক্ষ্মণ এভাবে চলে না গেলে আমি তাঁর কাছে শেষবারের মত ক'টি কথা বলে পাঠাতাম।"

সীতা একাকী ঘুরতে ঘুরতে এক সাধুর কুটিরের সামনে উপস্থিত

হলেন। সাধু তখন সমিধ্ আহরণ করার জন্য কুটিরের দ্বারে এসেছেন। সীতাকে দেখে তাঁর মন করুণায় গলে গেল। তিনি সীতাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিলেন।

যথাকালে সাধুর আশ্রমে সীতার একটি পুত্র সন্তান হল। তার নামকরণ হল লব। সীতা তাঁর শিশু সন্তানকে সাধুর কাছে রেখে কুটির থেকে বেরোতেন ফলমূল সংগ্রহ করার জন্য। প্রতিদিনই যাবার সময় তিনি সাধুকে জানিয়ে যেতেন। কিন্তু সেদিন সাধুকে ধ্যানমগ্ন দেখে তিনি শিশুকে সঙ্গে নিয়েই বেরোলেন। এদিকে ধ্যান ভঙ্গ হলে সাধু আসন থেকে উঠে শিশুটিকে দেখতে পেলেন না। সাধু ভাবলেন শিশুকে নেকড়ে তুলে নিয়ে গেছে। মর্মাহত বিপন্ন সাধু ভাবতে লাগলেন সীতা ফিরে এলে তাঁকে তিনি কী বলবেন।

সাধু তখন একটি কুশপুত্তলিকা তৈরী করলেন। তারপর তিনি আকুল হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন যেন সেই কুশ-পুত্তলিকা জীবন লাভ করে। ঈশ্বরের কৃপায় কুশপুত্তলিকা জীবন্ত শিশু হয়ে সাধুর কুটির আলো করে হেসে উঠল দন্তহীন মুখে। হাত পা ছুঁড়ে খেলা করতে লাগল। সাধু নিশ্চিন্ত হলেন।

সীতা যথাসময়ে লবকে কোলে করে ঘরে ফিরলেন। ফিরে দেখলেন লবের খাটিয়ায় অবিকল লবেরই মত আরেকটি শিশু শুয়ে খেলা করছে। সীতা অবাক হয়ে গেলেন। সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন "বাবা এই শিশুটি কে? এ কার সন্তান? "সাধু বললেন" মা একে তুমি যখন পেয়েছ এ তোমারই সন্তান। তুমিই একে লালন পালন করো। কুশ থেকে এর উদ্ভব। তাই এর নাম রাখলাম আমি কুশ।"

সীতা তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে আরেকটি সন্তান পেয়ে খুশী মনে তাকে

মানুষ করতে লাগলেন। যথাকালে লবকুশ দুই ভাই দু'টি সর্বাঙ্গসুন্দর কিশোর হয়ে উঠল। একদিন তারা বনে মৃগয়া করতে গেল। সেখানে দৈবক্রমে রামও এসেছিলেন। এই কিশোরযুগলের সুন্দর চেহারা ও চালচলনে আকৃষ্ট হয়ে রাম এদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। লব কুশ বলল "আমাদের মা সীতাদেবী। পিতৃপরিচয় আমরা জানি না।" রামচন্দ্র নিজের পরিচয় দিলেন। ওদের কুটিরে যেতে চাইলেন। বালকরা উৎসাহভরে রামকে নিজেদের কুটিরে নিয়ে এল। দুজনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘোষণা করল "মা রামজী এসেছেন আমাদের কুটিরের দ্বারে। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকো।" সীতা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখে অবিরল অশ্রুধারা। তারপর তিনি ধরিত্রী মাকে ডেকে বললেন "মাগো তুমি দ্বিধা হও। আমাকে আশ্রয় দাও। যে স্বামী বিনা অপরাধে তার গর্ভিনী স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে আমি তার মুখ দেখতে চাই না।"

ধরনী দ্বিধা হলেন। সীতা চলে গেলেন পাতালে। রাম পাথর হয়ে গেলেন।

ভগবানের দান

একবার সম্রাট আকবর বিহারের বনে শিকার করতে গিয়েছিলেন। একটা হরিণের পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে কখন যে নিজের দলবল ছেড়ে হারিয়ে গেলেন খেয়ালই নেই। তাঁর তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় শরীর আনচান করছে।

সম্রাট দেখলেন কৃষকেরা রবিশস্য কাটছে। ওদের একজনের

কাছে খাদ্য ও আশ্রয় চাইলেন। দরিদ্র কৃষক নিজের কুটীরে নিয়ে গিয়ে আকবরকে অড়হর ডাল আর রুটি খেতে দিল। ক্ষুধার্ত সম্রাট এই সামান্য খাবারেই খুব পরিতৃপ্ত হলেন। আকবর কৃষককে বললেন কখন যদি প্রয়োজন হয় আমার কাছে এসো। কৃষক তিনি কোথায় থাকেন কী নাম জিজ্ঞাসা করাতে আকবর বললেন 'আমার নাম আকবর, আমি দিল্লীতে থাকি।'

সরল চাষী ভাবতেও পারেনি যে তার অতিথি স্বয়ং সম্রাট আকবর।

দেখতে দেখতে একবছর কেটে গেল! এই বছর ফসল ভাল হল না। যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী করে দিয়েও কৃষক সংসার চালাতে পারল না। তখন কৃষকের স্ত্রীর মনে পড়ল সেই অতিথি ও তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা। চাষীবৌ তার স্বামীকে বলল "চল আমরা দিল্লীতে গিয়ে তোমার বন্ধু আকবরের সঙ্গে দেখা করি।"

চাষী তো দিল্লীতে গিয়ে অনেক লোককেই জিজ্ঞাসা করল আকবরের ঠিকানা, কেউই কিছু বলতে পারল না। শেষকালে একজন লোক তাঁকে প্রাসাদের রাস্তা দেখিয়ে দিল। সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন সম্রাটের নিজের হাতে দান করার দিন। এইদিন আসার ফলে তাকে কেউ প্রাসাদে ঢুকতে বাধা দিল না।

চাষী কিন্তু এটাই যে প্রাসাদ আর সে যে স্বয়ং সম্রাটের কাছেই যাচ্ছে মোটেই বুঝতে পারেনি। সম্রাটের কাছে এলে সম্রাট তাকে ডেকে নিলেন আর নিজের কাছেই বসালেন। সরল চাষী দেখল আকবর সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসে আছেন সে জিজ্ঞাসা করল 'তুমি এমন করে বসেছ কেন? আকবর বললেন 'এমনি করে বসাই আমার

অভ্যাস। 'কৃষক তখন নিজের অভাবের কথা জানাল আকবরকে আর তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। সম্রাট তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। কৃষক তো খুব খুশী। এদিকে আকবরের রাজসভার লোকেরা কৃষককে বলে দিয়েছে যে, সে সম্রাট আকবরের রাজসভায় এসেছে। সম্রাট কৃষককে তাঁর প্রাসাদে দিন সাতেক থেকে যেতে বললেন।

সন্ধ্যাবেলায় কৃষক দেখল সম্রাট নমাজ পড়ছেন। কৃষক প্রাসাদের একজন পরিচারককে ডেকে জিজ্ঞাসা করল সম্রাট কী করছেন, কেন করছেন। তখন সেই লোকটি ওকে বলল সম্রাট ভগবানের আরাধনা করছেন কারণ ভগবানই মানুষকে ধনসম্পদ ও শক্তি দেন। তখন কৃষক ভাবল সম্রাট নিজেই যখন ভগবানের কাছে ধনসম্পদ চাইছেন তখন সম্রাটের কাছ থেকে টাকা নিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে ভগবানের কাছেই ধনসম্পদ প্রাথনা করা ভাল। সে তখন সম্রাটকে তাঁর টাকা ফেরৎ দিয়ে গ্রামে ফিরে যাবার জন্য রওনা হল। ফেরার পথে সে একটা কাচনার গাছের তলায় সাতদিন সাত রাত্রি ভগবানের কাছে ধনসম্পদ প্রার্থনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভেঙে দেখল সামনে মাটির তলা থেকে একটি ঘড়ার কানা দেখা যাচ্ছে।

তখনই জায়গাটি খুঁড়ে সে পেল একটি মোহরে ভর্তি ঘড়া। কৃষক তখন ভারী ক্লান্ত। ঘড়াটাও ভীষণ ভারী। তার আর এটা বাড়িতে বয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করল না। সে ভাবল ভগবান যখন করুণা করে তাকে এত ধন দান করেছেন তখন তিনিই তাঁর দান ওর বাড়িতে পৌঁছে দেবেন।

সে খুব খুশি মনে বাড়ি ফিরে নিজের স্ত্রীকে সব ঘটনা বলল।

দুজন চোর তখন ওর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তারা সব শুনে ফেলল। তখনই ওরা সেইখানে গিয়ে ঘড়াটা খুঁড়ে বার করল। কিন্তু যেই না ঘড়ার ঢাকাটা খুলেছে অমনই ফোঁসফোঁস করতে করতে ফণা তুলে বেরিয়ে এল একজোড়া সাপ। তখনই চোরেরা ঘড়ার মুখ ভাল করে বন্ধ করে দিল। ওরা ঠিক করল কৃষক যেমন ওদের ঠকিয়েছে ওরাও তেমনি কৃষকের বাড়িতেই দিয়ে আসবে এই সাপশুদ্ধ ঘড়া। কৃষকের বাড়ির চালের খানিকটা খড় সরিয়ে ওরা ঘড়াটা ঘরের ভিতর ফেলে দিল। ঘড়াটা পড়ার শব্দে কৃষক ও তার স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম থেকে উঠে তারা দেখল ঘরময় মোহরের ছড়াছড়ি। এদিকে চোর দুটো ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়েছে।

তখন কৃষক তার স্ত্রীকে বলল 'কেমন, বলেছিলাম না ভগবান নিজেই তাঁর দান পৌঁছে দিয়ে যাবেন। ঠিক তাই হল। তার স্ত্রী বলল 'আমরা কেন দরজাটা খুলে রাখলাম না তাহলে তো আর ভগবানকে চালের খড় তুলতে হত না কষ্ট করে।'

পীর পাহাড়ী

বিহারের মুঙ্গের জেলায় পীর পাহাড়ী একটি ছোট পাহাড়। সেই পাহাড়ের পাশে এক বিশাল নিমগাছ তার ছায়াশীতল ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। পথিক বন্ধু এই নিমগাছ শুধু তার শ্যামসুন্দর রূপ নিয়ে ছায়ার আসন পেতেই রাখে নি এই গাছ আর এই পাহাড়কে ঘিরে আছে অনেক লোককথা। লোকে বলে যখন মুঙ্গের শহরটা মুসলমান শাসনের অধিকারে গেল তখন দুর্গ এলাকায় হিন্দুদের প্রবেশ

নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একদিন এক হিন্দু যাদুকর এই আদেশ অমান্য করলেন।

এই পাহাড়ের অদূরেই থাকতেন একজন মুসলমান পীর। তাঁর নামেই পাহাড়ের নাম। তাঁর এই হিন্দু যাদুকরের আদেশ অমান্য করাটা পছন্দ হল না। তিনি যাদুকরকে একখানি উপহার গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠালেন কিন্তু সঙ্গে পাঠালেন একটি নিষিদ্ধ মাংসের মোড়ক। নম্র যাদুকর সবই বুঝতে পারলেন। তিনি নিষিদ্ধ মাংসের মোড়ক স্পর্শও করলেন না এবং সুন্দর চিঠি লিখে মোড়কটি ফেরৎ দিলেন।

পীরের অনুচররা তাঁর পাঠানো উপহার ফেরৎ নিয়ে এল কিন্তু মোড়ক খুলে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল, মাংসের বদলে মিষ্টি।

তখন পীরের খুব আগ্রহ হল হিন্দু যাদুকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। পীর বাঘের পিঠে চড়ে যাদুকরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন তার আস্তানায়। বাড়ীর প্রাচীরে বসে যাদুকর নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করছিলেন। পীরের মত একজন শ্রদ্ধেয় অতিথিকে যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য যাদুকর এগিয়ে এলেন। প্রাচীরকে আদেশ করলেন চলতে। প্রাচীরও চলতে লাগল। চলন্ত প্রাচীরে বসেই যাদুকর পীরের মুখোমুখি হলেন। প্রাচীরের উপর উপবিষ্ট হয়ে আসার সময় যাদুকর নিজেই দাঁতনটি পুঁতে রেখে এলেন।

পীর তখন সশ্রদ্ধ মনে হিন্দু যাদুকরের ক্ষমতাকে স্বীকার করলেন। সেই নিমের ডালটুকুই আজকের বিশাল নিমগাছ। এই ঘটনার পর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।

হরসু ব্রহম্

প্রাচীনকালে বিহারের চৈনপুর গ্রামে এক রাজা ছিলেন। রাজা শালিবাহনের কুলপুরোহিত ছিলেন হরসু পাঁড়ে। হরসু কনৌজিয় ব্রাহ্মণ। বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গে সুপণ্ডিত বুদ্ধিমান কূটনীতিজ্ঞ। রাজা শালিবাহন তাঁকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। রাজার দৈনন্দিন জীবনে বহু জটিল সমস্যার সমাধান করে দিতেন রাজপুরোহিত হরসু।

শালিবাহনের দুই রানী ছিলেন। ছোট রানী রাজার প্রিয় ছিলেন বেশি। কনৌজ থেকে হরসু পাঁড়ে আসার আগে রাজা ছোট রানীর কাছেই সব বিষয়ে পরামর্শ চাইতেন। কিন্তু রাজপুরোহিত হরসু আসার পর রাজা শালিবাহন তারই উপর বেশি আস্থা রাখলেন। এবং রানীর সঙ্গে পরামর্শ করা ছেড়ে দিলেন। ছোটরানীর মর্যাদায় আঘাত লাগল। ঈর্ষায় জ্বলে যেতে লাগল তাঁর মন। তিনি দিবারাত্র চিন্তা করতে লাগলেন কি ভাবে হরসু পাঁড়ের সর্বনাশ করা যায়। কী করে তাঁকে রাজার দু'চোখের বিষ করে দেওয়া যায়। এদিকে সম্মানীয় রাজপুরোহিত হরসু শীঘ্রই রাজার অনুগ্রহে একখানি অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে লাগলেন।

শেষে সুযোগ এসে গেল। হরসুর অমঙ্গল কামনায় বিষাক্ত মন নিয়ে অনেক বিনিদ্র রাত্রি কাটাতেন রানী। এমনি এক রাত্রে অসুখী রানী অলিন্দে পদচারণা করছিলেন। চোখে পড়ল হরসুর বাড়ির ছাদ থেকে একটা অস্বাভাবিক আলো চারদিকে বিকীর্ণ হচ্ছে। রানী রাজাকে জাগালেন। সেই অদ্ভুত আলো দেখালেন। রাজাও হতবাক্

হয়ে গেলেন সেই আলো দেখে। রানী বললেন "মহারাজ ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে আপনি একান্ত বিশ্বাসভাজন বলে গ্রহণ করেছেন। তাকে আপনার সমস্ত গোপন কথা ও দুর্বলতা জানতে দিয়েছেন। সমগ্র রাজ্য এখন তাঁর নখদর্পণে। তিনি এখন আর পৌরোহিত্যবৃত্তিতে সন্তুষ্ট নন। তাঁর ব্রাহ্মণোচিত নির্লোভ নষ্ট হয়ে গেছে। তিনিএখন রাজপদাভিলাষী। তাই ঐ দেখুন তিনি আপনার নিধনের জন্য অভিচার ক্রিয়াকলাপে মগ্ন আছেন যখন সমগ্র রাজ্য সুষুপ্তিতে লীন।" ছোট রানী রাজার হৃদয়ের অধীশ্বরী, তাঁর কথা বিশ্বাস করতে রাজার বেশিক্ষণ লাগল না। রানী বললেন "মহারাজ যে ব্রাহ্মণ আপনার নিধনের জন্য চেষ্টা করছে তাকে আপনি কী করে আশ্রয় দেবেন? নিজেকে নিধন না করে তো আপনি রাজধর্ম পালন করতে পারবেন না। আপনি হরস্থকে আপনার রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করুন।"

রাজা আর ঘুমতে পারলেন না ক্রোধে অনুশোচনায় অস্থির রাজা পরদিন আদেশ করলেন হরস্থুর বাড়ি ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। তাঁকে দান করা জমিও কেড়ে নিলেন রাজা। পণ্ডিত, পূতচরিত্র, ধার্মিক ব্রাহ্মণ গৃহহারা হলেন। তিনি রাজপ্রাসাদের দ্বারে আমরণ অনশন করে বসে রইলেন।

বড়ো রানীর এক মেয়ে ছিল। মমতাময়ী সেই কন্যা তার নিজের প্রাসাদে হরস্থ পাঁড়ের স্ত্রী-পুত্রকে আশ্রয় ও আহার দান করল। রাজা শালিবাহনকে তাঁর কন্যা অনেক বোঝাল। বলল "পিতা আপনি ভুল করছেন। হরস্থ পাঁড়ে নিঃস্বার্থ, নির্লোভ ধার্মিক ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গে আপনি রূঢ় ব্যবহার করবেন না। ওঁর কাছে ক্ষমা চান। ওঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন নূতন অট্টালিকা নির্মাণ করে।" রাজা

নিজের ভুলে অটল রইলেন।

নিরপরাধ ব্রাহ্মণ প্রাসাদের দেউড়ীতে মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে রাজা রাজপুরোহিতের যোগ্য মর্যাদায় তাঁর শবযাত্রার আয়োজন করলেন।

তাঁর মরদেহকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে চন্দনচর্চিত করা হল। শুচিশুভ্র শ্বেতবস্ত্রে আবৃত করে সেই দেহ ফুলে ফুলে ঢেকে দেওয়া হল। গঙ্গামাটি দিয়ে তাঁর বুকে কপালে রামনাম লিখে দেওয়া হল। গজদন্তের পালঙ্কে তাঁর দেহ স্থাপন করে হরিধ্বনি সহযোগে বারাণসীতে সৎকার করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হল।

চিতা প্রস্তুত। চন্দনকাঠের চিতায় অনেক কলসি ঘি ঢেলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দেহটি চিতায় স্থাপন করা হবে। কিন্তু তা আর হল না। যারা উপস্থিত ছিল সবাই দেখল হরসু পাঁড়ে চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঋজু ঊর্ধদেহ ব্রাহ্মণ। নিরাবরণ বক্ষে শোভিত যজ্ঞোপবীত ভাস্বর হয়ে রয়েছে। স্কন্ধে আলম্বিত উত্তরীয়। মহিমান্বিত নির্ভয় নিঃসঙ্কোচ মূর্তি ব্রাহ্মণের। উচ্চগ্রামে অভিশাপ দিলেন হরসু পাঁড়ে "রাজা তুমি আমাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছ। সেই পাপে আমি ব্রহম্ (ব্রহ্মদৈত্য) হয়েছি। আমি তোমার বংশের সবাইকে নিধন করব। শুধু তোমার কন্যা যে আমার পুত্রকন্যাকে বাঁচিয়েছে সেই বাঁচবে আমার রোষের কবল থেকে।" অভিশাপ দিয়ে মিলিয়ে গেল ব্রাহ্মণের মূর্তি বাতাসে।

রাজা শালিবাহনের মৃত্যু ঘটল অভিসম্পাত বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে। রাজার বংশধরেরা অচিরেই লুপ্ত হয়ে গেল পৃথিবী থেকে। শুধু তাঁর মেয়ের বংশধারাটি রইল অব্যাহত।

চৈনপুরে শেরশাহের নির্মিত একটি দুর্গ আছে। তারই ভিতরে আছে একটি মন্দির। সেখানে আছে একখানি পাথর। সেই পাথরকে সবাই পূজা করে। হরস্থ ব্রহম্ দেবতারূপে। ভক্ত মানুষ আনে উপবীত আর মিষ্টান্ন আপন মনস্কামনা পুরণের প্রার্থনায়। তিনি তাঁর ভক্তদের বাসনা পূর্ণ করেন।
